শাশ্বত ভারত

অসুরের কথা

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

পরিমার্জিত দে'জ প্রথমসংস্করণ :
—বৈশাখ, ১৩৬৬

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
প্রবীর সেন

মুদ্রাকর :
সতীশচন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড
৯এ মনমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু



দেবতার সঙ্গেই অসুরের কথা। অসুরকে বাদ দিয়ে দেবতার কথা সম্পূর্ণ হয় না। অসুরের কথাও আমরা গুরুজীর কাছে শুনেছিলাম।

গুরুজী বলতেন: দেবতার দেশ এই ভারতবর্ষ। কিন্তু আজ এই দেশের দিকে তাকিয়ে বেদনায় বুক ভরে ওঠে। দুঃখ দুর্দশার জন্য বেদনা নয়, যুদ্ধ করে দুঃখকে জয় করা যায়। আমার বেদনা হয় নিজেদের বিস্মৃতির কথা ভেবে। আমাদের ঐতিহ্য তো এক বছরের নয়, এক হাজার বছরেরও নয়। এ দেশ জেগে-ছিল পৃথিবীর জন্মের দিনে। অন্য দেশের মানুষ যখন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটত, এ দেশ তখন সভ্যতার শিখরে উঠেছে। এই সত্য কথা আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। কেউ মনে করিয়ে দিলেও শুনতে চাই নে। বিদেশকে আজ আমরা অন্ধ ভাবে অনুসরণ করে আনন্দ পাই।

গুরুজীর আশ্রমে আমরা সবাই মিলে শুনতাম। তিনি বলতেন: দেবতার দেশ এই ভারতবর্ষ। কিন্তু এ দেশে তো শুধু দেবতারই বাস ছিল না। তাঁদের সঙ্গেই একসঙ্গে বাস করতেন অসুর দৈত্য দানব রাক্ষস যক্ষ রক্ষ নাগ গন্ধর্ব অপ্সরা কিন্নর বিদ্যাধর বানর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি। দেবতার মতো মানুষও ছিলেন কত। ঋষি মনীষী সাধু মহাত্মা মহাপুরুষ বীর কবি শিল্পী গায়ক, কত জ্ঞানী গুণী পুরুষ ও নারী। কত ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ছিল এই দেশ। মন্দিরময় তীর্থ জনপদ শৈলাবাস, কত দুর্গ কত ইতিহাস, পুরাণ দর্শন সাহিত্য, সঙ্গীত নৃত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান। কজন জানে এই দেবতার দেশকে, জানে এই দেশের গৌরবের কথা!

মিথ্যা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া আমি শেষ করেছি, কিন্তু এ সব কথা সেখানে শুনি নি। গুরুজীর কথায় আমার রোমাঞ্চ হত আরও অনেকের মতো।

হৃষীকেশের অপর পারে গঙ্গার তীরে একটি ছায়াচ্ছন্ন আশ্রম। ছোট ছোট কুটীর ছিল অনেকগুলি। এমনি একটি কুটীরের সামনে উপাসনার মন্দিরে আমি গুরুজীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

সবাই তাঁকে গুরুজী বলত। বয়স তাঁর অনুমান করতে পারি নি। সৌম্য মুখে জরার চিহ্ন নেই, আছে ঋষিসুলভ প্রসন্নতা। শিষ্যরা তাঁর কাছে অধ্যয়ন করছিল।

আশ্রম সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম মহর্ষি রমনের আশ্রম দাদাজীর আশ্রম গান্ধীজীর আশ্রম, এমনি অনেক আশ্রমের নাম শুনেছি। এ সে রকম আশ্রম নয়। এখানে এসে আমার টোলের কথা মনে পড়েছিল। সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতরা টোল খুলতেন। শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিতরা। কত দূর দূর দেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত। গরিব ছাত্র, পণ্ডিত মশাইও গরিব। অনেক অসচ্ছলতায় এই সব টোল চলত। কিন্তু সেদিন সেই শিষ্যদের দেখে টোলের ছাত্র বলে মনে হয় নি। বয়সে সবাই নবীন নন, অনেকেই লেখাপড়া সম্পূর্ণ করে এসেছিলেন। দু একজন প্রবীণও ছিলেন। তাঁরাও মনোযোগ দিয়ে গুরুজীর কথা শুনছিলেন।

আমি এই অঞ্চলে এসেছিলাম কেদার বদরী দর্শনের জন্য। কিন্তু সে সৌভাগ্য এল না। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে গুরুজীকে দেখতে এসে তাঁর আশ্রমে আমি বাঁধা পড়ে গেলাম।

তাউজীর উপরে এই আশ্রমের পরিচালনার ভার। তাউজী জ্যাঠামশাইকে বলে। কিন্তু এখানে দেখলাম সবাই তাঁকে তাউজী বলছেন। চোখে রূপোর চশমা এঁটে তিনি তাঁর বাঁধানো খাতায় আমার নাম লিখে নিলেন। একখানা খাতা আর পেনসিল দিয়ে বললেন : সকাল বেলায় তোমরা আশ্রমের প্রয়োজনীয় কাজ করবে, আর দুপুরে লেখাপড়া। গুরুজীর কাছে আমরা পাঠ নেব সন্ধ্যা বেলায়।

একে একে আশ্রমবাসীদের সঙ্গে পরিচয় হল। আর পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই পরিচয় অন্তরঙ্গও হতে লাগল।

প্রথমেই গুরুজী দেবতার কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন ঋষির কথা। আর এঁদের সঙ্গেই অসুরের কথা আছে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে। এঁরা সবাই সমসাময়িক। অস্যতি ক্ষিপতি দেবান্ অস্ ক্ষেপণে ইতি উরন্, তার মানে সুর বিরোধী দৈত্য। এ পৌরাণিক অর্থ। ঋগ্বেদে অসুর শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। বৈদিক ঋষিরা দেবতাকেই অসুর নামে অভিহিত করেছেন। হে অসুর হে প্রচেতঃ হে রাজন্, আমাদের এই যজ্ঞে বাস করে আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর।

বেদের অসুর কেমন করে পুরাণের অসুর হলেন, সেই কথা দিয়েই গুরুজী অসুরের কথা আরম্ভ করলেন।



সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠবার আগেই আমরা উপাসনার মন্দিরে সমবেত হলাম। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় পরিবেশ মোহময় মনে হচ্ছিল। আজ থেকে অসুরের কথা আরম্ভ হবে। অসুরের কথা কি দেবতার কথার মতো পবিত্র হবে! অসুরকে আমরা শ্রদ্ধা করি না। শ্রদ্ধা করতে শিখি নি। আমাদের সংস্কারে ঘৃণা জন্মেছে অসুরের প্রতি, যেমন পাপের প্রতি আমাদের সহজাত ঘৃণা। তবু গুরুজী আমাদের কাছে অসুরের কথা বলবেন। কেন বলবেন, আমি সেই কথাই এক মনে ভাবছিলাম।

এমন সময় গুরুজী এসে আসন গ্রহণ করলেন। তারপর সবাইকে একবার দেখে নিয়ে বললেন : শাশ্বত ভারতের প্রথম সমাজে শুধু দেবতা নয়, আরও অনেক প্রাণী ছিল। দেবতার সঙ্গে ছিল অপ্সরা গন্ধর্ব ও যক্ষ, আর অন্য দিকে অসুর দৈত্য দানব ও রাক্ষস। আর ঋষির সঙ্গে ছিল সাধারণ মানুষ। এদের সকলের কথা না বললে এ দেশের প্রথম সমাজের কথা সম্পূর্ণ হবে না।

বেদের আদিতে আমরা দেবতা ও ঋষির কথাই শুধু পাই। ঋষিরা তখন অসুর নামেই দেবতার স্তব করতেন। যার অসু বা বল আছে, যে শত্রু নাশ করে, আর অসবঃ বা প্রাণাঃ দদাতি যে সেই বৃষ্টিদাতা বা প্রাণদাতা অসুর। ঋগ্বেদে ঋষি অগস্ত্য ইন্দ্রকে বলছেন, নৃণ্ পাহি অসুর অস্মান্। হে ইন্দ্র, তুমি অসুর, তুমি আমাদের পালন কর। তারপর ভরদ্বাজ ঋষিও ইন্দ্রকে বলছেন, বৃহৎ অসুর্যমস্য মহৎ অসুরঃ ইন্দ্র ইব। বৃত্র বধের জন্য তিনি ইন্দ্রকে অসুর্য বা অসুর বলছেন। অন্যান্য মন্ত্রে মিত্র বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতাকেই অসুর বলা হয়েছে।—হে অসুর হে প্রচেতঃ হে রাজন্, আমাদের এই যজ্ঞে বাস করে আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর। শুধু দেবতা নয়, কোন কোন রাজা এমন কি ঋত্বিকদেরও অসুর নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের শেষের দিকে দু এক স্থানে অন্য অর্থে অসুর শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তাতে শ্রদ্ধা নয়, কিছু নিন্দা যেন মিশ্রিত হয়ে আছে। কেমন করে এই অর্থ এল তা নিয়ে পণ্ডিতরা অনেক অনুসন্ধান করেছেন। পৌরাণিক যুগে এই অসুর শব্দের অর্থ একেবারে পালটে না গেলে আমরা হয়তো কিছুই লক্ষ্য করতাম

না। পুরাণে দেবতা অর্থে অস্থর শব্দের ব্যবহার এক জায়গাতেও হয় নি। এ খুবই আশ্চর্যের কথা।

যে পণ্ডিতরা প্রাচীন আর্য ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা একটা কৈফিয়ৎ দেন। ইরাণীয় শাস্ত্র গ্রন্থ অনুসরণ করে তাঁরা সেই কৈফিয়ৎ খুঁজে পেয়েছেন। দেবতাকে ইরাণীয়রা অহুর বলে। আর অস্থরকে বলে দেব বা দয়েব। 'হে জরথুস্ত্র, যখন তুমি একত্রে পলায়নপর পৌত্তলিক ও তস্কর ও দেবগণকে আক্রমণ করবে, তখন সেই উচ্চার্য শব্দ উচ্চারণ কোরো—দেবগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে, দেব উপাসকগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে—'

এই সব উক্তি থেকেই দেখা যাচ্ছে যে বৈদিক আর্যদের সঙ্গে ইরাণীয় আর্যদের একটা আদর্শগত বিবাদ হয়েছিল। ঋগ্বেদের মন্ত্র থেকেও এই কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে একদা দেবতা ও অস্থরে কোন প্রভেদ ছিল না। সমাজে দুইই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তারপর হয়তো আদর্শের সংঘাত বেধেছিল। ইরাণীয় আর্য ও বৈদিক আর্যরা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। মনে হয় যে ইরাণীয় আর্যরা বৈদিক আর্যদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই ইরাণীয় আর্যরা হল অস্থর আর বৈদিক আর্যরা দেবতা। ইরাণীয় পার্সীরা এখনও অস্থরের উপাসক এবং বৈদিক আর্যরা আজও দেবতার উপাসনা করছে, আর নিন্দা করছে অস্থর শক্তিকে।

আদর্শের সংঘাত হয়েছিল কী নিয়ে পণ্ডিতেরা তাও খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন। অনেকে মনে করেন যে সোমরস এই বিবাদের অন্যতম কারণ। কোন উদ্ভিদের নাম সোম। এই সোমের পাতার রস পান সমাজে খুবই প্রচলিত ছিল। কেউ তাজা রস পান করতেন, কেউ বা নেশার জন্য এই রস মাদক রূপে পান করতেন। যজ্ঞেও সোমরস আহুতি দেবার প্রথা ছিল। ঋগ্বেদের দেবতারা সবাই সোমপায়ী। কাজেই মনে হয় যে বৈদিক আর্যরা সোমরস মাদক রূপে পান করতেই ভালবাসতেন এবং ইরাণীয় আর্যরা তা ভালবাসতেন না বলেই বিবাদ শুরু হয়েছিল।

বিবাদের অন্য কারণ বোধ হয় পশুমেধ ব্যবস্থা। এক দল ছিলেন পশুমেধকারী আর অন্য দল ভাবতেন যে যজ্ঞের আগুনে পশু আহুতি দিলে অগ্নির পবিত্রতা নষ্ট হয়। বৈদিক আর্যরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন, তাঁরাই পশুমেধকারী বলে পরিচিত।

গুরুজীর কথা শুনে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। অন্য সকলের মুখের দিকে তাকিয়েও আমার এই কথাই মনে হল। সবাই আশ্চর্য হয়েছিলেন, সকলের কাছেই এ কথা একেবারে নূতন বলে মনে হয়েছে। দেবতারা বা দেবতার উপাসকেরা দুর্বল ছিলেন, তাঁরা নেশার জন্য সোমপান করতেন, আর

যজ্ঞে পশু আহুতি দিতেন আদিম মানুষের মতো—এ সব কথা আমাদের অনভ্যস্ত কানে অবিশ্বাস্য মনে হয়। এই ঘটনাকে বিশ্বাস করতে হলে বাকি কথাটাও বিশ্বাস করতে হয়। অসুর বা অসুরের উপাসকেরা বলশালী ছিলেন, তাঁরা সোমরস পান করে মাতাল হতে চাইতেন না এবং যজ্ঞে পশু আহুতি দেবার বিরোধিতা করতেন। এই অসুর অবশ্য পৌরাণিক অসুর নয়, ঋগ্বেদে এই অসুরেরা স্তুত হয়েছেন। তারপর যখন তাঁরা স্বর্গরাজ্য থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করে দিলেন, তখন থেকেই তাঁরা নিন্দার পাত্র হয়ে দাঁড়ালেন। পুরাণে তাঁদের নিন্দার অন্ত রইল না।

গুরুজী বললেন: এ বিষয়ে চূড়ান্ত গবেষণা হয়েছে কিনা জানি না। নূতন কোন আলোকপাত করা সম্ভব কিনা তাও আমার জানা নেই। তোমাদের মধ্যে এক দিন কেউ এ চেষ্টা করবে, এই আশাতেই আমি অসুরের কথা বলব। অসুরের কথা দুর্বলের কথা নয়, শক্তিমানের কথা। দেবতারা চিরকাল ভয় পেয়েছে অসুর শক্তিকে। অসুর শব্দে কতটুকু নিন্দা আছে, তাও আমরা বিচার করে দেখব।

গুরুজী বললেন: ঋগ্বেদে আমরা বর্তমান অসুর অর্থে অসুরের যে উল্লেখ পাই, তার মধ্যে বৃত্র ও অহি খুবই পরিচিত, কিন্তু শুষ্ণ তত পরিচিত নয়।

বৃত্রাসুরের নাম আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। দধীচি মুনির অস্থি দিয়ে যে বজ্র তৈরি হয়েছিল সেই বজ্রে ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধ করেছিলেন। কিন্তু সে পুরাণের গল্প। বেদের বৃত্র ও অহির গল্প আমরা দেবতার কথায় শুনেছি। গুরুজী বলেছিলেন, বেদের ইন্দ্র যোদ্ধা, তিনি শত্রুঞ্জয়। বৃত্র ও অহিকে তিনি বধ করেছেন। 'বৃত্র কথাটি বৃ ধাতু থেকে আবরণ অর্থে আর অহি কথাটি হন্ ধাতু থেকে হননার্থে নিষ্পন্ন। বৃত্র যা আবরণ করে থাকে, অহি যা সাপের মতো জড়িয়ে থাকে। ইন্দ্রের বৃত্র বধ একটি রূপক। বৃত্র ও অহি অসুর—এখানে অসুর অর্থ প্রধানত বলশালী। তারা মেঘ, তাদের পৃথিবী আবরণকারী আকাশ আচ্ছন্নকারী বিরাট শরীর। তারা জলকে বদ্ধ করে রেখেছে। বজ্রহস্ত ইন্দ্র তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, তাদের ধ্বংস করলেন। জলের গতি মুক্ত হল। মেঘ ধ্বংস হয়ে বৃষ্টিপাত হল।' বেদের এই রূপক থেকেই পুরাণে বৃত্রাসুর বধের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

গুরুজী বললেন: শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে এই বৃত্রকে দেবতাও বলা হয়েছে। 'হে ইন্দ্র, যখন সেই এক দেব (বৃত্র) তোমার প্রতি আঘাত করেছিল তখন তুমি অশ্বপুচ্ছের ন্যায় হয়ে সে আঘাত নিবারণ করেছিলে।' কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ঋগ্বেদে দেবতা ও অসুর শব্দের ব্যবহারে বিশেষ প্রভেদ নেই।

এই প্রসঙ্গে ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ জেন্দ আভেস্তার একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তাদের পরম দেবতা অহুরমজ্‌দ জরথুস্ত্রকে বলছেন, অসুরের সৃষ্ট বেরেথ্‌ঘ্ন সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী। বেরেথ্‌ঘ্ন শব্দটির উৎপত্তি বৃত্রঘ্ন থেকে, যেমন অজিদহক অহিদহক থেকে। অর্থাৎ বৃত্রকে যে হত্যা করেছে দেবতাদের সৃষ্ট সেই ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী। অসুর তাদের দেবতা, বৃত্রঘ্ন তাদের সম্মানের পাত্র, কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি তাদের অশেষ ঘৃণা। ইন্দ্র পাপমতি দেব বা দয়েব। জেন্দ আভেস্তায় আছে, 'আমি ইন্দ্রকে সৌরুকে ও দেব নাস্ত্যত্যকে এই গৃহ থেকে এই পল্লী থেকে এই নগর থেকে এই দেশ থেকে এই পবিত্র অখণ্ড জগৎ থেকে দূর করে দিই।' সৌরু সূর্য কিনা জানি না, নাস্ত্যত্য নাসত্য হতে পারে। বেদের নাসত্যদ্বয় হলেন অশ্বিনীদ্বয়।

গুরুজী বললেন : শুষ্ণ অসুর বধও রূপক। শুষ্ণ মানে অনাবৃষ্টির অকল্যাণ। ইন্দ্র শুষ্ক মরুভূমিতে জল দান করেন, এই অর্থেই শুষ্ণবধ।

ঋগ্বেদ আমি পড়ি নি। ঋগ্বেদ কেন, কোন বেদই আমার পড়া নেই। রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদ করেছেন, দুর্গাদাস লাহিড়ীও বেদের অনুবাদ করে গেছেন, আরও অনেকে হয় তো জনসাধারণের মধ্যে বেদের প্রচারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে সমস্ত চেষ্টাই যে সার্থক হয় নি, তাতে আমার সন্দেহ নেই। আমার পরিচিত কেউ বেদ পড়েছেন বলে আমার জানা নেই।

বেদ আমাদের আদি গ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ। অথচ আমাদের দেশ থেকে বেদাধ্যয়ন এ যুগে উঠে গেছে। কোন কোন মন্দিরে বেদ পাঠ হয় শুনেছি, তা শোনবার আগ্রহ কারও হয় কিনা জানি না। অথচ বাইবেল পাঠ কোরাণ পাঠ গ্রন্থসাহেব পাঠ মানুষকে কত মহৎ করে।

আমি বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। সহসা শুনলাম যে গুরুজী তাউজীর সঙ্গে কিছু পরামর্শ করছেন। বললেন : আজ কোন অসুরের কথা বলব কিনা বল।

তাউজী বললেন : সাধারণ ভাবে আর কিছু বলবেন না ?

গুরুজী বললেন : বলেছি তো, এ গবেষণার বিষয়। দেবতা ও অসুরের জন্ম কথা নিয়ে সবাই কিছু ভাবুক।

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : আজ এই পর্যন্তই থাক। অসুরের কথার ভূমিকাটি তোমরা লিখে ফেল। কাল থেকে আমরা পৌরাণিক অসুরের কথা শুরু করব।

পরে গুরুজী আমাকে আর একটু উপদেশ দিয়েছিলেন, কিছু ইংরেজী ও বাঙলা

বই পড়ে নিতে বলেছিলেন। সে সব বইএর নাম আমি টুকে নিয়েছিলাম, পড়েছিলামও কিছু কিছু। কিন্তু ভাল লাগে নি। ভাল লেগেছে মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা 'ঋগ্বেদের দেবতা ও মানুষ'। বইখানি আমি সম্প্রতি পড়েছি। কিন্তু প্রথম দিন গুরুজী যা বলেছিলেন তার অনেক কথাই আছে এই বইএ। মূল্যবান কথা।



প্রভাতে যথারীতি আমরা সব্জি বাগানের কাজে নামলাম। আমি ও পাধ্যে। সময় পেলে পাধ্যের কাছে আমি সংস্কৃত পড়ি। এই দৃঢ় বলিষ্ঠ মানুষটি স্বল্পবাক্। মহারাষ্ট্রের কোন কলেজের অধ্যাপক বলেই মনে হয়। দৈহিক পরিশ্রমের প্রতি একটা অনুরাগ আছে। এই জন্যেই আশ্রমের কোদালটি তিনি অধিকার করে এই বাগানের কাজে মন দিয়েছেন। আমি পরে আশ্রমে এসেছি। আমাকে সহকারী রূপে দলে নিতে তিনি আপত্তি করেন নি। একখানা খুরপি সংগ্রহ করে আমিও তাঁর সঙ্গে সব্জির চাষ করছি।

আমাদের উৎসাহ দেখে আশ্রমের কর্মকর্তা তাউজী আমাদের ভাল বীজ এনে দিয়েছিলেন। সেই বীজ থেকে চারা বেরিয়েছে। এই চারা বড় হয়ে কবে ফল দেবে তার ঠিক নেই। কিন্তু পাধ্যে খুব খুশী হয়েছেন। বলছেন : পরিশ্রম করলেই ফল পাওয়া যায়।

আমি বললাম : ফল কোথায়, এ তো চারা !

পাধ্যে বললেন : এই চারা থেকেই এক দিন ফল হবে।

আমি হেসে বললাম : তবে আমাদের এত কষ্ট করে বীজ পোঁতবার কী দরকার ছিল ! বলতে পারতাম যে ঐ বীজ থেকেই ফল হবে।

পাধ্যে এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর বললেন : বীজ রক্ষায় সৃষ্টির আনন্দ নেই। আনন্দ অঙ্কুরোদ্গমের পর।

পিছন থেকে স্বপ্তি বলে উঠল : মা ফলেষু কদাচন।

আমি ফিরে দেখবার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাউজীর এই প্রগল্ভ মেয়েটি যেন সর্বত্র আছে। কখনও গম্ভীর হতে দেখি নে, কখনও দেখি নে স্থির হয়ে কিছু করতে। তাউজী বলেন : মাতৃহীন মেয়ে বলেই ঐ রকম

সেও পাধ্যের কাছে সংস্কৃত শিখতে আসত, আর আসত চেম্নলু নামে অন্ধ্রের একটি ছেলে। ওরা আর নিয়মিত আসে না। দুপুর বেলায় চেম্নলু শুয়ে থাকে, আর স্বপ্তি সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়।

স্বপ্তি যে আশ্রমের সামনের দিকে গেল, তাতে আমার সন্দেহ নেই। সামনে চেম্নলুরা ফুলের বাগান করছে।

পাধ্যে খুব সহজ ভাবে বললেন : স্বপ্তি ঠিকই বলেছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

পাধ্যে বললেন : ফলের প্রত্যাশা না রেখেই কাজ করা আমাদের কর্তব্য।

তারপর বললেন : এই যে আমরা অনেকে এখানে সমবেত হয়েছি, আমরা কি কোন ফলের আশা নিয়ে এসেছি! আমাদের নতুন জ্ঞান লাভ হচ্ছে, এতেই আনন্দ।

বললাম : আমরা যে আবার এই সমস্ত কথা নিজেদের ভাষায় লিখে রাখছি, সে লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশ হলেই ফল লাভ হবে।

পাধ্যে বললেন : গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এখানে এসেছিলে কি?

এই প্রশ্নে আমার নিজের জীবনের কথা মনে এল। আমার পিতা আমাকে ইঞ্জিনিয়ার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে নিরাশ করেছি। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় আমার অঙ্কের নম্বর দেখে সায়ান্স পড়াতে আর তিনি সাহস পান নি। বলেছিলেন, জাত পণ্ডিতের বংশ, এসব পারবে কেন! পণ্ডিতের বংশে জন্ম বলে সত্যিই আমি গর্ব করতে পারি। আমার পিতামহ বিদ্যাভূষণ, মাতামহ তর্কবাগীশ। প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহরাও বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন।

কলেজে আমি সংস্কৃত লজিক ও ইতিহাস পড়লাম। দু বছর পরে সংস্কৃতও বাদ দিতে হল, বংশের গৌরব রক্ষা করতে পারলাম না। বাবা বললেন, ওর উকিল হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।

বাবার ইচ্ছা মতো আইনের পরীক্ষা দিয়ে আমি বেরিয়েছি। পরীক্ষার ফল যত দিন না বেরোয়, তত দিন আমার ছুটি। এই ছুটিতে হিমালয় দেখবার অনুমতি পেয়েছিলাম। আমার মারও এই সব দুর্গম তীর্থ দর্শনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাবার আগ্রহ ছিল না। শেষ পর্যন্ত সাংসারিক প্রয়োজনে তাঁরা আসতে পারেন নি। আমাকেও তাঁরা একা ছেড়ে দেন নি। আমরা দুই বন্ধুতে এখানে এসেছিলাম। পথের দুর্গমতা ও অনিশ্চিত জীবন যাপনের কথায় ভয় পেয়ে সে মসুরি চলে গেছে। যাবার সময় আমাকেও সে অনেক অনুরোধ করেছিল, কিন্তু আমি রাজী হই নি। মনে মনে আমার যে ভয় ছিল না তা নয়। বিশেষত সঙ্গী হারিয়ে সেই ভয়

আমার বেড়েছিল। তাইতেই আমি হৃষীকেশের ধর্মশালায় এসে উঠেছিলাম, ভাব করেছিলাম যাত্রীদের সঙ্গে। একজনকে হারিয়ে দশজনকে পাবার চেষ্টায় সময় কাটাচ্ছিলাম।

ঠিক এই সময় আমি গুরুজীর সংবাদ পেলাম। খুব স্বাভাবিক কারণে তাঁকে দেখবার বাসনা হল। কিন্তু তাঁকে দেখতে এসে একটা দুরন্ত মোহে বাঁধা পড়ে গেলাম। শুধু যে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন নত হয়েছিল তা নয়। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কথায় দেহে আমার রোমাঞ্চ হয়েছিল, আর মনে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম। সে যন্ত্রণা বেদনাদায়ক নয়, সে যন্ত্রণায় এক মধুর উপলব্ধি ছিল। মনে হয়েছিল, এই ঐতিহ্যের ভাগ আমারও আছে, আমিও এই বিরাট গৌরবের উত্তরাধিকারী।

সেদিন আমি গুরুজীর কথা কতটুকু শুনেছিলাম! কিন্তু ঐ সামান্য কয়েকটি শব্দ যে আমার অন্তরাত্মাকে এমন গভীর ভাবে নাড়া দেবে তা বুঝতে পারি নি। হৃষীকেশের ধর্মশালায় ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত আমি ঘুমতে পারি নি। আমার মনে হচ্ছিল যে গুরুজী ঠিকই বলেছেন, আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছি। অতীত ভুলে গেলে ক্ষতি নেই, কিন্তু ঐতিহ্য যে আমাদের প্রাণ। মা যেমন নিজের বুকের রক্ত দিয়ে সন্তানকে লালন করে, তেমনি একটা জাতি তার জীবন দিয়ে দেশের ঐতিহ্য গড়ে তোলে। কৃষ্টি তো একটা মানুষের এক দিনের পরিশ্রমের ফল নয়, একটা সমগ্র দেশ যুগ যুগ পরিশ্রম করে তিলে তিলে কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে। আমাদের এই বিস্মৃতির জন্য তো আমরাই দায়ী। আমাদের বিদেশী প্রভু আমাদের অন্ধ করে রাখবেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু আমরা কেন ঘুমিয়ে থাকব!

গুরুজীর আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য মন আমার তৈরি হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল যে আমি বুঝি এমনি কোন আহ্বানের জন্য এত দিন অপেক্ষা করে ছিলাম। পর দিনই গুরুজীর আশ্রমে এসে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে পাধ্যে আবার জিজ্ঞাসা করলেন: কই, উত্তর দিচ্ছ না যে! তুমি কি কোন ফল লাভের আশায় এই আশ্রমে এসে জুটেছ?

আমার অন্যমনস্কতা ঘুচে গিয়েছিল। বললাম: আমাদের ঐতিহ্যের কথা শোনবার লোভে এখানে এসেছি।

আর কোনও লোভ?

লোভ আর কিসের !

পুণ্যের লোভ, নামের লোভ, অর্থের লোভ ?

বললাম : লোভ শুধু জ্ঞানের, অন্য লোভ আমার নেই।

খুশী হয়ে পাধ্যে বললেন : আমিও সেই কথাই বলছি। বীজ থেকে চারা গজিয়েছে, এতেই আমাদের আনন্দ। জল দাও, যত্ন কর। যদি ফল হয় তো সেটা উপরি লাভ হবে।

আমার তর্কের কথা মনে পড়ে গেল। বললাম : আমিও সেই কথাই বলেছিলাম। আমরা বই লিখছি। যদি নাম হয়, পয়সা হয় তো সে আমাদের উপরি লাভ হবে।

আমি হার স্বীকার করলাম না দেখে পাধ্যে হাসলেন, বললেন : লোভের পয়সা অসুরে খাবে, দেবতার ভোগে লাগবে না।

এবারে আমিও হাসলাম।



দুপুর বেলায় অনেক চেষ্টা করেও আমি কিছু লিখতে পারলাম না। দেবাসুরের দ্বন্দ্বে আমার মন ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিল। দেবতা ও অসুর সম্বন্ধে একটা মন-গড়া কাহিনী রচনা করতে পারছিলাম না। প্রাচীন আর্য জাতি একটাই ছিল। তারাই দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যেই কাউকে দেবতা ও কাউকে অসুর বলত কিনা জানি না। তবে দেবতা ও অসুরদের যে তারা শ্রদ্ধা করত তাতে সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদ এই সময়ের রচনা। দেবতা ও অসুরে তখনও বিবাদ হয় নি। দেবোপাসক ও অসুরোপাসক আর্যরা তখনও একত্র বসবাস করত। তারপর বিবাদ শুরু হল। সে বিবাদ সোমরস পান নিয়ে, আর যজ্ঞে পশুবলি ও পশু আহুতি নিয়ে। যারা সোমরস তাজা পান করত, আর পশুবলির ও যজ্ঞের আগুনে পশু আহুতির বিরোধী ছিল, তাদের সঙ্গে বিরোধ বাধল অন্য দলের, যারা সোমরস মাদক অবস্থায় পান করত আর যজ্ঞে পশুবলি দিয়ে আগুনে আহুতি দিত। যারা শক্তিশালী তাড়া তাড়িয়ে দিল দুর্বলদের। ইরাণীয় আর্যরা তাড়িয়ে দিল বৈদিক আর্যদের। বৈদিক আর্যরা ভারতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করল। ঋগ্বেদ রচনা তখন প্রায় সমাপ্ত হয়েছে।

অসু মানে বল, তাই অসুর মানে বলশালী। অসুররা বা অসুরোপাসকরা তাড়িয়ে দিল দেবতাদের বা দেবোপাসকদের। অসুররা স্বর্গ রাজ্য থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করল। অসুররা অমৃতের আস্বাদ পায় নি। যে সোমরস পান করে মাতাল হওয়া যেত তা শুধু দেবতারাই খেত।

তারপর এল নিন্দা। দেবতারা অসুরদের নিন্দা করল, আর অসুররা দেবতাদের। ক্রমে ক্রমে এই নিন্দা ঘৃণায় পর্যবসিত হল। তারপর দেবাসুরের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম। আমাদের পুরাণ যখন রচিত হল, তখন অসুর একটি নিন্দিত জাতি। দেবদ্বেষী পরাক্রান্ত জাতি। দেবতাদের সঙ্গে তাদের বারে বারে যুদ্ধ হয়েছে, বিষ্ণু অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, আর মহামায়া অস্ত্রধারণ করেছেন অসুর সংহারে।

এই অসুর সম্বন্ধে আমার অনেক কথা মনে হয়েছে। সে সমস্তই একান্ত ভাবে আমার নিজের ধারণার কথা। আমি যে সব অসুরের নাম জানি তারা বলশালী ছিলেন, বেদজ্ঞ ধার্মিক সত্যবাদী ও দানশীল। দেবতাদের উপরেই তাঁদের আক্রোশ ছিল, কিন্তু জনসাধারণ তাঁদের বিদ্রোহাচরণ করে নি। তাঁদের কোন চারিত্রিক দুর্বলতার কাহিনী আমার জানা নেই। যারা ঋষিদের যজ্ঞ নষ্ট করত, তারা রাক্ষস। এই রাক্ষসদের রাজা ছিলেন রাবণ। রাবণের পিতা বিশ্রবা মুনি। অসুর দৈত্য দানব রাক্ষস এ সমস্ত নামই পুরাণে নিন্দাবাচক। এদের বংশ পরিচয় আলাদা। দৈত্য ও দানবের পিতা হলেন কশ্যপ মুনি। তাদের মাতা দক্ষ প্রজাপতির দুই কন্যা দিতি ও দনু। অসুরের কথায় দৈত্য দানব ও রাক্ষসদের কথাও নিশ্চয়ই এসে পড়বে।

সারা দিন একটা অস্বস্তি নিয়ে কাটিয়ে সন্ধ্যা বেলায় উপাসনার মন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। একে একে সবাই এলেন। চেম্বলু পাধ্যে দণ্ডপানি শকুন্তলাদি মিসেস খুরানা। যাঁদের সঙ্গে পরিচয় ভাল হয় নি, তাঁরাও এলেন। তাউজী এলেন গুরুজীর সঙ্গে। তিনি যে গুরুজীর ঘরে ছিলেন সে কথা আমি সুপ্তির কাছে শুনেছিলাম। সুপ্তি সংক্ষেপে বলেছিল : পরামর্শ হচ্ছে ?

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : কিসের পরামর্শ।

গুরুজী কী বলেছিলেন মনে নেই ?

কী বলেছিলেন ?

সুপ্তি গম্ভীর ভাবে বলল : অসুরের কথার ভূমিকা যারা লিখে ফেলে নি, তাদের আজ বসতে দেওয়া হবে কিনা !

চেঙ্গলু খানিকটা দূরে বসেছিল। বলে উঠল: তাহলে সবাইকে তুলে দিতে হবে।

স্বপ্তি তার মুখে আঁচল চেপে হেসে উঠতে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময়ে গুরুজী এলেন তাউজীর সঙ্গে। গুরুজী তাঁর নিজের আসনে বসলেন, আর তাউজী বসলেন আমাদের সঙ্গে। আমরা পরম আগ্রহে গুরুজীর কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রদীপের আলোয় গুরুজী সবাইকে একবার দেখে নিলেন। তারপর বললেন: কোন্ অসুরের কথা দিয়ে এই কাহিনী আরম্ভ করব, সেই কথাই ভাবছিলাম।

তাউজী বললেন: দেবী মাহাত্ম্য থেকেই শুরু করুন।

গুরুজী বললেন: তোমার যুক্তিটা মন্দ নয়। পুরাণের দৈত্য দানব ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপের বংশধর। কাজেই তাদের কথা পরে আসবে। তার আগে দেবী মাহাত্ম্যর অসুর। মার্কণ্ডেয় পুরাণের একাশি থেকে তিরানব্বুই অধ্যায় দেবী মাহাত্ম্য নামে পরিচিত। দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠ শুনেছ?

শকুন্তলাদি বললেন: শুনেছি।

গুরুজী বললেন: দেবী মাহাত্ম্যকেই আমরা চণ্ডী বলি। দেবী যে সব অসুর বধ করেছেন চণ্ডীতে তার বর্ণনা আছে।

দণ্ডপাণি প্রশ্ন করলেন: কোন্ দেবী?

গুরুজী বললেন: দেবী মহামায়া।

মহামায়া কোন্ দেবী?

গুরুজী হেসে বললেন: রাজা সুরথ মার্কণ্ডেয় ঋষিকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে ঋষি বলেছিলেন, তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তিনি চিরকালই আছেন। এই জগৎ তাঁর মূর্তি এবং তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। দেবতাদের প্রয়োজনে যখন তিনি আবির্ভূত হন, তখন লোকে বলে যে তিনি আবার উৎপন্ন হয়েছেন। কিন্তু পুরাণের আদি অসুর মধু কৈটভকে দেবী মহামায়া নিজের হাতে বধ করেন নি, তাদের বধ করেছিলেন বিষ্ণু। কল্পান্তে যখন তিনি সমুদ্রে অনন্ত নাগের উপরে যোগ নিদ্রায় মগ্ন, তখন তাঁর কর্ণ মল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর উৎপন্ন হয়। তারা ব্রহ্মাকে সংহার করতে উদ্যত হলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে আশ্রয় নেন। বিষ্ণু তখন নিদ্রামগ্ন। তাই ব্রহ্মা অসুরদের ভয়ঙ্কর প্রকৃতি দেখে বিষ্ণুকে জাগাবার জন্য যোগ নিদ্রার স্তব আরম্ভ করেন। যোগ নিদ্রাই বিশ্বের ঈশ্বরী, জগতের ধাত্রী ও স্থিতিসংহারকারিণী। ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হয়ে তিনি বিষ্ণুর দেহ থেকে নির্গত হতেই তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। বিষ্ণু দেখলেন যে দুই পরাক্রান্ত

অসুর ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করবার জন্য উদ্যত হয়েছে। তাই দেখে তিনি উঠেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

গুরুজী বললেন : কালিকা পুরাণে এই কাহিনী কিছু অন্য রকম। পৃথিবী তখন প্রলয় জলে নিমগ্ন। সৃষ্টি কালে এই পৃথিবীকে প্রাণীর বসবাসের উপযুক্ত করতে হবে, এই উদ্দেশ্যে যোগ নিদ্রা বিষ্ণুর কাছে এসে দেখলেন যে তিনি সুপ্ত, তাঁকে জাগাতে হবে। যোগ নিদ্রা তাঁর আঙ্গুল দিয়ে বিষ্ণুর কর্ণের মল একে একে চূর্ণ করে দিলেন। দুই কর্ণ থেকে দুই অসুরের জন্ম হল। প্রথম অসুর উৎপন্ন হয়েই মধু পানের প্রার্থনা জানাল, এই কারণে দেবী তাঁর নাম রাখলেন মধু। দ্বিতীয় অসুরকে মহামায়ার হাতে কীটের মতো মনে হয়েছিল বলে তার নাম হল কৈটভ। মহামায়া বললেন, তোমরা না চাইলে বিষ্ণুও তোমাদের বধ করতে পারবে না। তোমরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কর।

অসুররা বিষ্ণুর শরীরের উপর বিচরণ করবার সময় তাঁর নাভিপদ্মে ব্রহ্মাকে দেখতে পেল। বলল, যদি বাঁচতে চাও তো বিষ্ণুকে জাগাও। ভীত হয়ে ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করে তাঁকে তুষ্ট করলেন। বললেন, আমাকে রক্ষার জন্য আপনি বিষ্ণুকে জাগান। মহামায়া বিষ্ণুকে জাগিয়ে দিলেন. আর বিষ্ণু জাগ্রত হয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

এই পর্যন্ত বলে গুরুজী থামলেন। গল্প শুনতে শুনতে আমার একটি কথা মনে আসছিল। দেবী মাহাত্ম্যের মধু কৈটভ জন্মের পরেই ব্রহ্মাকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছিল। ক্ষুধার তাড়নায়, না অকারণে হিংসা করেছিল, তা জানা যায় না। কালিকা পুরাণের মধু কৈটভকে মহামায়া বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেছিলেন। কিন্তু বিষ্ণু নিদ্রিত বলে ব্রহ্মাকে তারা ভয় দেখিয়েছিল, বাঁচতে হলে বিষ্ণুকে জাগাও। ব্রহ্মাকে তারা সংহার করে নি, যুদ্ধ করেছিল বিষ্ণুর সঙ্গে। মহামায়া কেন এই যুদ্ধ করতে বলেছিলেন তার কারণ অনুমান করা যায়। বিষ্ণুকে জাগানোর প্রয়োজন। প্রলয়ের জলে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করে প্রজা সৃষ্টির উপযোগী করতে হবে।

গুরুজী বেশিক্ষণ নীরব রইলেন না, বললেন : অসুরদের সঙ্গে বিষ্ণু পাঁচ হাজার বছর যুদ্ধ করলেন। কিন্তু তাদের বধ করতে পারলেন না। ব্রহ্মা ভয়ে কাতর হয়েছিলেন, মহামায়াকে অনুরোধ করেছিলেন অসুরদের মোহিত করবার জন্য। শেষ পর্যন্ত মহামায়া মধু কৈটভকে বিমোহিত করলেন। তারা বিষ্ণুকে বলল, তোমার যুদ্ধে নৈপুণ্য দেখে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর নাও।

বিষ্ণু এর সুযোগ নিতে একটুও দ্বিধা করলেন না, বললেন, যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাক

তো এই বর দাও যেন তোমাদের আমি বধ করতে পারি। অসুররা বলল, তোমার যুদ্ধে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। কাজেই তোমার হাতে মৃত্যু হওয়াই প্রশস্ত। তবে যেখানে জল নেই সেইখানে তুমি আমাদের বধ কর।

গুরুজী বললেন: সমস্ত জগৎ জলময় দেখে অসুররা ভেবেছিল যে বিষ্ণুকে এই কথা বলে বঞ্চনা করতে পারবে। দেবী মাহাত্ম্যে এই বঞ্চনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু আমার মনে হল যে মধু কৈটভ বিষ্ণুকে বঞ্চনা করেন নি, বরং বিষ্ণুই অসুরদের বঞ্চনা করেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে তিনি ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু অসুররা বঞ্চিত হয়েও সত্যভ্রষ্ট হতে চায় নি। হয়তো ভেবেছিল যে জলে বধ কোরো না বললে বিষ্ণু তাদের বধ করতে পারবেন না। এ প্রস্তাব অন্যায় নয়, এ খুবই স্বাভাবিক। এই কথাতেই অসুরদের চরিত্র আরও প্রাণবন্ত হয়েছে।

গুরুজী বললেন: কালিকা পুরাণে আছে যে ব্রহ্মা এক শিলা স্থাপন করলেন। এত বড় শিলা কেমন করে ধারণ করা হল তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। দেবী মাহাত্ম্যে এ কথা নেই। মধু কৈটভের মৃত্যু খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। অসুরদের কথায় সম্মত হয়ে বিষ্ণু নিজের কোলের উপর তাদের রেখে চক্র দিয়ে তাদের মাথা কাটলেন। কালিকা পুরাণ আরও একটু যোগ করল। অসুরদের মেদে দৃঢ় হয়ে পৃথিবীর অপর নাম হল মেদিনী।

মধু কৈটভের ইতিবৃত্তের এইখানেই শেষ। কিন্তু এই কাহিনী শুনে অসুরদের সম্বন্ধে আমার ধারণার একটুও পরিবর্তন হল না। মধু কৈটভ বীর ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বীর বীরত্বের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করে নি, আর সত্য রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়ে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেল। এই হল পুরাণের প্রথম অসুরের পরিচয়।



গুরুজী বললেন: দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীতে মধু কৈটভের পরে আমরা মহিষাসুরের কাহিনী পড়ি। এই কাহিনী মধু কৈটভের মতো প্রাচীন নয়। পৃথিবীতে তখন দেবতা আছেন, অসুর আছে, মানুষও আছে।

চণ্ডীর তৃতীয় ও শেষ কাহিনী শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধ। তখন আমরা ঋষিদেরও

দেখতে পাই। ভৃগু আছেন, বৃহস্পতি আছেন, শুক্রাচার্যও আছেন। কশ্যপও এই সময়ের ঋষি। তাঁর দুই স্ত্রী দিতি ও দনু দৈত্য ও দানব জাতির জননী। হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ দিতির দুই দুর্ধর্ষ পুত্র। দনুর ছিল চল্লিশ পুত্র। তাদের অনেকেরই কথা পুরাণে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রাবণের পিতা বিশ্রবাও ছিলেন সমসাময়িক ঋষি।

গুরুজীর এই কথায় এক অদ্ভুত সমাজের চিত্র আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। স্বর্গে দেবতারা আছেন, তাঁদের সভায় গন্ধর্বরা গান করে, নাচে সুন্দরী অপ্সরা। যক্ষ ও কিন্নর থাকে স্বর্গের কাছাকাছি। কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তি থাকেন আরও উর্দ্ধে। স্বর্গচ্যুত হলে দেবতাদের যেতে হয় তাঁদের কাছে, তাঁদের সাহায্য না পেলে দেবতারা স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না।

এদিকে পৃথিবীতে আছেন ঋষি মানুষ নাগ বানর প্রভৃতি নানা জাতি। তাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই, এমন কি অসুর দৈত্য দানবরাও পৃথিবীর কোন প্রাণীর সঙ্গে বিবাদ করে না। কোন রাক্ষস এসে ঋষির যজ্ঞ নষ্ট করে গেলে তা নিয়ে কোন বিরাট ঘটনা ঘটে নি। আসল বিবাদ ছিল দেবতা ও অসুরের। এই অসুর বলতে আমরা দৈত্য দানব ও রাক্ষসও বুঝি। তারা স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করত, দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিত, নিজেরা রাজা হয়ে দেবতাদের সকল কার্য করত। তখন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কাছে যেতেন, অসুরদের পরাস্ত করবার উপায় উদ্ভাবন করতেন। কখনও বিষ্ণু জন্ম নিতেন অবতার রূপে, কখনও বা দেবী মহামায়া আবির্ভূত হতেন। দেবী মাহাত্ম্যের দ্বিতীয় অসুর মহিষ, তাঁকে বধ করেছিলেন দেবী নিজে।

মহিষাসুরের কাল নির্ণয় করা খুব কঠিন কাজ নয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আমরা তাঁর পিতার নাম দেখি জম্ভ, অন্যান্য পুরাণে রম্ভ নাম। দেবী পুরাণে আমরা রম্ভ ও করম্ভ নামে দুই ভাইকে দেখি। তাঁরা দনুর পুত্র। দনু কশ্যপের স্ত্রী। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে রম্ভের পুত্র মহিষ দানব, তিনি কশ্যপ মুনির পৌত্র। হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ ছিলেন দৈত্য পরে কশ্যপের পুত্র দিতির গর্ভে তাঁদের জন্ম।

গুরুজী বললেন: কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে, এর চেয়ে বেশি কিছু অনুমান করা হয়তো সম্ভব নয়। সে যুগে দু-দশ বছরের হিসাব রাখা হত না, হিসাব ছিল মন্বন্তরের। প্রাণীর জীবনে হাজার দশ হাজার বছরের হিসাব। এক শো বছরের ব্যবধানও পুরাণকার উল্লেখযোগ্য মনে করতেন না। জননীরা বলবান পুত্র দশ মাসে প্রসব করতেন না। শত বর্ষ কেন, পাঁচ শো বছরও তাঁরা গর্ভধারণ করতেন।

ঋষি ও অসুরেরা কথায় কথায় দশ হাজার বৎসর তপস্যা করতেন, তারপর ফিরে এসে সবাইকে দেখতেন আগের মতো, এই দশ হাজার বৎসরে পৃথিবীতে কোন পরিবর্তন হত না। সেই জন্যেই বলছি যে এই যুগের কথায় পরম্পরা রক্ষা খুবই কঠিন কাজ।

এই পর্যন্ত বলে গুরুজী খানিকক্ষণ থামলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের কথা আমার মনে পড়ল। অনেক অসুর ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু পুরাণের গল্পে মনে হয়েছে যে ইন্দ্র একজনই। অনেকে অবশ্য বলেছেন যে ইন্দ্র স্বর্গের রাজার সাধারণ নাম। স্বর্গরাজ্যে যখন যিনি রাজা হয়েছেন, তখন তিনিই ইন্দ্র নামে পরিচিত হয়েছেন। লোমশ মুনির কথায় আমরা এই কথাই জেনেছি। কিন্তু ইন্দ্রের চরিত্র একই রকম। চরিত্রের মিল দেখে একাধিক ইন্দ্র ছিলেন ভাবতে আমাদের ইচ্ছা করে না।

গুরুজী কী ভাবছিলেন তা আমাদের বললেন না। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন ঃ থাক এ সব কথা। তার চেয়ে মহিষাসুরের গল্প আজ শেষ করি।

তাউজী বললেন ঃ সেই ভাল।

গুরুজী বললেন ঃ মহিষাসুরের পিতা কেমন করে এই মহাবলশালী পুত্র পেলেন তার সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। পুরাণে পুরাণে কিছু পার্থক্য আমরা দেখতে পাই সত্য, কিন্তু তাদের মূল কথা একই। শিবের অংশে জন্ম হয়েছিল মহিষাসুরের।

প্রথমে দেবী পুরাণের গল্প বলি।

রম্ভ ও করম্ভ দুজন প্রধান দানব। তাঁদের পুত্র সন্তান নেই। পুত্র লাভের জন্য তাঁরা পঞ্চনদের জলে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। ভয় পেয়ে ইন্দ্র এলেন কুমীরের রূপ ধারণ করে, আর করম্ভকে বিনাশ করলেন। ভাইএর মৃত্যুতে রম্ভ প্রথমে ক্রোধে অধীর হয়েছিলেন, পরে আত্মহত্যায় উদ্যত হলেন। বাম হাতে নিজের চুলের মুঠি ধরে ডান হাতে মাথা কাটতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাধা দিলেন অগ্নি। অগ্নি তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, আত্মহত্যা কোরো না রম্ভ, এ মহাপাপের কাজ। তার চেয়ে তুমি তোমার অভিলষিত বর নাও।

আত্মহত্যায় বিরত হয়ে রম্ভ বললেন, আপনি যদি প্রীত হয়ে থাকেন, তবে আমাকে এই বর দিন যে শিবের অংশে আমার এক পুত্র হোক। সেই পুত্র দেব দানব ও মানবের অজেয় মহাশক্তিশালী ত্রিলোক-বিজয়ী হবে।

অগ্নি বললেন, তথাস্তু।

মহিষাসুরের জন্ম হল অগ্নির বরে।

আমি এই কাহিনী শুনে কয়েকটি নূতন কথা শিখলাম। সুপুত্র লাভের জন্ম অসুররা কঠোর তপস্যা করতেন, আর ভাইকে হারিয়ে তাঁরা আত্মহত্যার কথা ভাবতেন। আরও একটি কথা আমার মনে এল। অগ্নি যেন সত্যের সাক্ষী! ইন্দ্র যখন অন্যায় করছেন, তখন অগ্নি এসেছেন তার কিছু প্রতিবিধান করতে। ভ্রাতৃ শোকে উন্মত্ত অসুরকে তিনি রক্ষা করে গেলেন।

গুরুজী বললেন: মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুরের পিতার নাম জম্ভ। এই জম্ভাসুর ইন্দ্রের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। তার পর কঠোর তপস্যা করে মহাদেবকে তুষ্ট করেন। মহাদেব বর দিতে চেয়েছিলেন, জম্ভাসুর ত্রিভুবনজয়ী পুত্র লাভের বর নেয়। দেবর্ষি নারদ এই সংবাদ দিলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হলেন। হৃষ্ট মনে জম্ভাসুর যখন বাড়ি ফিরছিলেন, ইন্দ্র তাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করলেন। কিন্তু জম্ভ তখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো না। স্নান করবার নামে সরোবরে গিয়ে উপস্থিত হলে সেখানে তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে ফিরে এলেন। এই মিলনের ফলেই মহিষাসুরের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু জম্ভ তখন জীবিত নেই, ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

তাউজী বললেন: এই জম্ভ নাম বোধহয় রামায়ণে পড়েছি।

গুরুজী হেসে বললেন: ঠিক কথা। সেই জম্ভ সুন্দ অসুরের পুত্র, তার বিবাহ হয়েছিল সুকেতু যক্ষের কন্যা তারকার সঙ্গে। মারীচ ও সুবাহু তাদের দুই পুত্র।

গুরুজী একটু স্মরণ করে বললেন: জম্ভ নাম আরও অনেকের ছিল। হিরণ্যকশিপুর এক পুত্রের নাম জম্ভ, প্রহ্লাদের ভ্রাতা সে। প্রহ্লাদেরও এক পুত্রের নাম জম্ভ। আবার হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াধুর পিতার নামও জম্ভ। কিন্তু এইখানেই এই নামের শেষ নয়। যত দূর মনে পড়ছে, বলির সখা এক দৈত্যের নামও জম্ভ, ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়।

তাউজী বললেন: এবারে মহিষাসুরের কাহিনী বলুন।

গুরুজী বললেন: ব্যস্ত কেন! তার বাপের কথাই তো এখনও শেষ হয় নি।

তারপরে বললেন: বামন পুরাণে রম্ভাসুরের কাহিনী দেবী পুরাণের প্রায় অনুরূপ। তফাৎ এই যে ভ্রাতৃবিয়োগে কাতর রম্ভ নিজের মাথা কেটে অগ্নিতে হোম করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাইতেই অগ্নি হোমাগ্নি থেকে উত্থিত হয়ে রম্ভকে নিরস্ত করে বর দান করেন। হৃষ্ট মনে রম্ভাসুর যখন গৃহে ফিরছিলেন তখন পথে এক মহিষীর দেখা পান। তারই সঙ্গে মিলনে মহিষাসুরের জন্ম।

গুরুজী বললেন: এই রম্ভাসুরের কাহিনী কালিকা পুরাণেও আছে। দীর্ঘ

কাল রম্ভ মহাদেবের আরাধনা করেছিল। তাতে তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে বর দিতে চাইলেন। রম্ভ বললেন, প্রভু, আপনাকে আমি তিন জন্ম পুত্র রূপে পেতে চাই। আপনি চিরায়ু অজেয় ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়ে আমার পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করুন।

মহাদেব বললেন, তথাস্তু।

বর পেয়ে রম্ভাসুর যখন প্রসন্ন মনে ফিরছেন, তখন পথে এক তরুণী কন্যাকে দেখতে পেলেন। তারই সঙ্গে মিলনের ফলে মহিষাসুরের জন্ম হয়।

গুরুজী এবারে কন্যা শব্দটি ব্যবহার করলেন। তাতে কোন্ জাতির কন্যা তা বোঝা গেল না।

গুরুজী বললেন : এর পরে মহিষাসুরের গল্প। মহাদেবের বরে মহিষাসুর দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলেন। কালিকা পুরাণের মতে তিনি ঘোর মায়াবী ছিলেন এবং নানা রূপ ধারণ করতে পারতেন। এক দিন তিনি মোহিনী নারী মূর্তি ধারণ করে হিমালয়ে কাত্যায়ণ ঋষির রৌদ্রাশ্বেয় আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ঋষির এক শিষ্যের মনোহরণ করে তার তপোভঙ্গ করলেন। এই অনাচার দেখে ঋষি অসুরকে শাপ দিলেন যে নারীর হাতে তাঁর মৃত্যু হবে।

দেবী ভাগবতে আমরা আর একটি কথা দেখি। মহিষাসুরের অত্যাচারে অস্থির হয়ে দেবতারা যখন বিষ্ণুর কাছে গেলেন তখন বিষ্ণু বললেন যে ব্রহ্মার বরে এই অসুর পুরুষের হাতে অবধ্য, কোন পুরুষ প্রাণী মহিষাসুরকে বধ করতে পারবে না।

কেন জানি না, আমার মনে হয় যে ব্রহ্মার বরের কথাটাই ঠিক, আর কাত্যায়ণ ঋষির গল্পটা সত্য নয়। যে অসুর মহাদেবের বরে দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করে স্বর্গ রাজ্য অধিকার করতে পারেন, তিনি নারী মূর্তিতে কাত্যায়ণ ঋষির শিষ্যদের ভোলাতে যাবেন বলে বিশ্বাস হয় না। তবে শৈশবে খেলাচ্ছলে যদি এমন কাজ করে থাকেন তো সে স্বতন্ত্র কথা।

তাউজী বললেন : নানা পুরাণের আলোচনায় মূল কাহিনীর রস ভঙ্গ হচ্ছে। আপনি যে কোন একটি পুরাণ থেকে সম্পূর্ণ গল্পটি বলুন।

এই উপদেশ শুনে গুরুজী হাসলেন, বললেন : দেবী মাহাত্ম্য থেকেই তাহলে গল্পটা বলি।

তাউজী গম্ভীর ভাবে বললেন : তাই বলুন।

গুরুজী বললেন : পুরা কালে একশো বছর ধরে দেবাসুরের সংগ্রাম হয়েছিল। এই যুদ্ধে দেবতারা অসুরদের হাতে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হলেন। অসুরদের

রাজা মহিষ স্বর্গ থেকে দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজে ইন্দ্র হয়ে স্বর্গে রাজত্ব করতে বসলেন, আর স্বর্গচ্যুত দেবতারা মনের দুঃখে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁদের দুর্দশার আর সীমা রইল না।

এমনি করে দু এক যুগ নয়, তিন মন্বন্তর কাল মহিষাসুর নিষ্কণ্টকে ত্রিভুবন ভোগ করলেন। তারপর এক রাত্রে একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলেন। হিমালয়ে নিদ্রার সময় তিনি দেখলেন যে দেবী ভদ্রকালী রূপ ধারণ করে তাঁর শিরশ্ছেদ করে করাল হাস্যে লোল জিহ্বায় তাঁর রক্তপান করছেন। এই স্বপ্ন দেখবার পর মহিষাসুর একাগ্র মনে দেবীর আরাধনা করতে লাগলেন। তাঁর পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে দেখা দিলেন। মহিষাসুর তাঁকে প্রণাম করে বললেন, দেবী, আমার স্বপ্ন যে মিথ্যা হবে না তা আমি জানি, কিন্তু তার জন্য আমি একটুও দুঃখিত নই। ত্রিভুবনে ভোগের আর কিছু আমার বাকি নেই। এখন তোমার কাছে আমার একটি মাত্র ভিক্ষা, চির দিন আমাকে তোমার পদসেবার অধিকার দাও, আর দাও সমস্ত যজ্ঞের ভাগ।

দেবী বললেন, বৎস, যজ্ঞের ভাগ আর অবশিষ্ট নেই, দেবতারা নিজেদের মধ্যে সব ভাগ করে নিয়েছেন। তবে তোমার প্রার্থনা আমি রাখব। যেখানে আমার পূজা হবে, সেখানে তুমিও পূজা পাবে। তোমাকে আমি আমার পদসেবার অধিকার দিলাম।

গুরুজী বললেন ঃ এই স্বপ্নের কথা আছে কালিকা পুরাণে, তারপর দেবী মাহাত্ম্য থেকে মহিষাসুর বধের কথা বলি।

তাউজী এবার আর কোন কথা বললেন না।

গুরুজী বললেন ঃ দুর্দশাগ্রস্ত দেবতারা ব্রহ্মার সঙ্গে বিষ্ণু ও শিবের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের উপর মহিষাসুরের অত্যাচারের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। মহিষাসুর শুধু ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য নয় যমের নরক কুবেরের ধনাগার অগ্নি ও বরুণের অধিকারক্ষেত্রও কেড়ে নিয়েছেন। তাঁকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

দেবতাদের কথা শুনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সরোষে ভ্রূভঙ্গি করলেন। সেই সময় তাঁদের বদন মণ্ডল থেকে এক মহাতেজ নির্গত হল। তারপর সমস্ত দেবতাদের দেহ থেকেই সেই রকম তেজ নির্গত হল। ক্রমে সেই প্রদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ থেকে এক অদ্ভুত নারী মূর্তির আবির্ভাব হল। দেবতারা সেই ভীষণ অথচ প্রশান্ত দেবী মূর্তি দেখলেন, তারপর তাঁকে নিজেদের অস্ত্রাদি দিয়ে সজ্জিত করলেন। এই সময়ে দেবী অট্টহাস্য করে উঠলেন। আর সেই হাসিতে সমগ্র পৃথিবী উঠল কেঁপে।

তারপর অদূরে ঘোর গর্জন শোনা গেল। দেবীর অট্টহাস্য শুনে সদল বলে

মহিষাসুর এগিয়ে এলেন। বিপুল বিক্রমে দেবীর সঙ্গে তাঁরা যুদ্ধ করবেন। দেখতে দেখতে সেই বিরাট অসুর বাহিনী দেবীর সম্মুখীন হল। অগণিত রথ হস্তী অশ্ব পদাতিক তোমর ভিন্দিপাল শক্তি মুসল খড়্গ পরশু শূল পট্টিশ নিয়ে বিপুল সেনা দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল। দেবী তাদের সঙ্গে অবলীলায় যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর নিঃশ্বাস থেকে অসংখ্য প্রমথ সৈন্য সৃষ্টি হয়ে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল।

এই যুদ্ধে মহিষাসুরের সেনাপতিরা একে একে দেবীর হাতে নিহত হল। বাস্কল অসিলোমা বিডালাক্ষ চিক্ষুর ও চামর। তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হল মহিষাসুরের সঙ্গে। সেই মায়াবী অসুর কখনও মহিষের রূপে কখনও হস্তীর রূপে দেবীকে আক্রমণ করলেন। সিংহবাহিনী দেবী সেই হস্তী ও মহিষ বধ করলেন। তারপর তিনি পদদ্বারা অসুরের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করে তাকে শূল বিদ্ধ করলেন। মহিষাসুর তখন মহিষের দেহ থেকে অর্ধাঙ্গ বাহির করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। খড়্গের আঘাতে দেবী তাঁর শিরশ্ছেদ করলেন।

অসুরেরা হাহাকার করে পালিয়ে গেল। গন্ধর্বরা গান ও অপ্সরারা নৃত্য আরম্ভ করল। আনন্দে অধীর দেবতারা দেবীর স্তব করলেন।

আমি তখন দুর্গা মূর্তির কথা ভাবছিলাম। যে মূর্তিতে আমরা দুর্গার পূজা করি সেই মূর্তির সঙ্গে গুরুজীর বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। এ যেন মহিষাসুর বধের পূর্ব মুহূর্তের ছবি।

গুরুজী বললেন: কালিকা পুরাণের মতে মহিষাসুর তিনবার জন্মেছিলেন, আর দেবী তাকে তিনবার তিন মূর্তিতে বধ করেছেন। প্রথমবার অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডা রূপে, দ্বিতীয়বার ষোড়শভূজা ভদ্রকালী রূপে ও তৃতীয়বার দশভূজা দুর্গা রূপে।

বরাহ পুরাণে এর পরেও একটু ঘটনা আছে। মৃত্যুর পরে মহিষাসুর চৈত্রাসুর নামে খ্যাতিলাভ করেন। বিন্ধ্যাচলে দেবী তাঁকে বিনাশ করেন।

দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীর দ্বিতীয় কাহিনী এইখানেই সমাপ্ত হল।



গুরুজী বললেন: তারপর শুম্ভ নিশুম্ভের কাহিনী। দেবী মাহাত্ম্যে শুম্ভ নিশুম্ভের উৎপত্তি কথা নেই কিন্তু বামন পুরাণে আছে। তাঁরা কশ্যপ ও দনুর পুত্র, নমুচি এঁদের তৃতীয় ভ্রাতা। নমুচির নাম আমরা ঋগ্বেদে শতপথ ব্রাহ্মণে ও মহাভারতেও পাই। মহাভারতের নমুচি বিপ্রচিত্তি দানবের পুত্র, বিপ্রচিত্তি দনুর পুত্র। এ নমুচির কথা আমি পরে বলব।

বামন পুরাণের মতে শুম্ভ নিশুম্ভের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নমুচি ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। এই শোকে শুম্ভ ও নিশুম্ভ তঁাদের অসুর সেনা নিয়ে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করেন। প্রবল যুদ্ধ করে ইন্দ্রকে পরাজিত করে সমস্ত দেবতাকে তাঁরা তাড়িয়ে দেন।

এক দিন তাঁরা রক্তবীজ নামে এক অসুরকে দেখতে পেলেন। এই রক্তবীজ পূর্ব জন্মে মহিষাসুরের পিতা রম্ভাসুর ছিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভকে তিনি বললেন যে বিন্ধ্যাচলবাসিনী এক দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছে। তাঁর দুই অমাত্য চণ্ড ও মুণ্ড ভয়ে নর্মদার জলে লুকিয়ে আছে।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই দেবীকে বিনাশ করার সংকল্প করতেই চণ্ড ও মুণ্ড নদীর জল থেকে উঠে এল এবং রক্তবীজের সঙ্গে তাঁদের দলে যোগ দিল।

গুরুজী বললেন: এঁদের সম্বন্ধে আরও একটু কাহিনী আছে। স্বর্গ রাজ্য অধিকার করার আগে তাঁরা পাতালে বাস করতেন। একাসনে তাঁরা অযুত বৎসর তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের তপস্যায় প্রীত হয়ে ব্রহ্মা তাঁদের বর দিতে এসে-ছিলেন। তাঁরা অমরত্বের বর চান। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁদের এই বর দিতে অস্বীকার করেন। তখন তাঁরা প্রার্থনা করেন যে কোন পুরুষের হাতে যেন তাঁদের মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা তাঁদের সেই বর দেন।

এই বরলাভের পর শুম্ভের রাজ্যাভিষেক হয়। মহর্ষি ভৃগু পুরোহিত হয়ে তাঁকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ এর পরের ঘটনা। দেবতাদের পরাজিত করে শুম্ভ স্বর্গ রাজ্য অধিকার করেছিলেন। তারপর স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতারা বৃহস্পতির পরামর্শে দেবীর স্মরণ নিয়েছিলেন। দেবী রাজী হয়েছিলেন শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধে।

গুরুজী বললেন : দেবী মাহাত্ম্যে এই সব কথা নেই। তাতে শুধু শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধের কথাই বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ দেবতাদের রাজ্য অধিকার করে তাঁদের যজ্ঞের ভাগও গ্রহণ করছিলেন। দেবতারা এই নিগ্রহে দেবীর স্মরণ নিয়েছিলেন। দেবী তাঁদের দুর্দশা দেখে তাঁদের দুঃখ দূর করতে রাজী হয়েছিলেন।

দেবীর সঙ্গে শুম্ভ ও নিশুম্ভের যুদ্ধ কী করে বাধল, এই নিয়ে সামান্য মাত ভেদ আছে। বামন পুরাণের মতে অসুররা মহিষাসুর বধের প্রতিহিংসা নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং বিন্ধ্য পর্বতে দেবীর কাছে সুগ্রীব নামে এক অসুরকে দূত পাঠিয়েছিলেন। দেবীর নিকট উপস্থিত হয়ে দূত বলেছিল, দেবী, ত্রিলোকে তোমার মতো সুন্দরী যেমন নেই, শুম্ভ ও নিশুম্ভ তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, তুমি তাঁদের একজনকে বরণ কর।

বেবী মাহাত্ম্যেও সুগ্রীব এই বার্তা নিয়ে দেবীর কাছে এসেছিল। কিন্তু ঘটনা একটু অন্য রকম। দেবতাদের অনুরোধে দেবী এই অসুরদের বধ করতে রাজী হয়েছিলেন এবং মোহিনী মূর্তি নিয়ে হিমালয়ে বিরাজ করছিলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভের অমাত্য চণ্ড ও মুণ্ড এক দিন দেবীকে দেখতে পায়। তারপর প্রভুকে গিয়ে বলে, মহারাজ, হিমাচলে এক অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী নারীকে দেখে এলাম, এমন রূপ জগতে আর দেখি নি। দেবতাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠ রত্ন আপনি ভোগ করছেন, কিন্তু এমন রত্ন আপনার নেই। তাঁকে আপনি স্ত্রী রূপে নিয়ে আসুন।

সহসা আমার একটি প্রশ্ন মনে এল। শুম্ভ ও নিশুম্ভ বিবাহিত ছিলেন কিনা গুরুজী তা বলেন নি। মহিষাসুরের কথাও আমরা জানি না। এদের কোন পুত্র কন্যার নামও আমি শুনি নি। আরও একটি আশ্চর্যের কথা এই যে এঁদের অত্যাচারের কোন কাহিনী পুরাণে নেই। স্বর্গরাজ্য থেকে দেবতাদের তাড়িয়ে দেওয়া কোন অত্যাচার নয়। কোন ঋষি বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের বিবাদের কোন কথাও জানা যায় না। শুম্ভ অত্যাচারী হলে মহর্ষি ভৃগু এসে তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করতেন না। আমার একবার ইচ্ছা হয়েছিল যে গুরুজীকে আমি এই অসুরদের বিবাহিত জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু তার আগেই গুরুজী বললেন : শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই সংবাদ পেয়ে সুগ্রীবকে দূত পাঠালেন। দূত সেই পুরনো প্রস্তাব নিয়ে দেবীর কাছে উপস্থিত হল।

দেবী বললেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু বাধা কী জান? আমি একটা প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি। যে আমায় যুদ্ধে জয় করে আমার দর্প নাশ করবে, আমি তারই গলায় বরমাল্য দেব। শুম্ভ ও নিশুম্ভ যখন দেবতাদের জয় করেছেন, তখন আমাকে

জয় করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হবে না। যুদ্ধে আমাকে জয় করতে বল।

কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য হল। শুম্ভ ও নিশুম্ভ মহিষাসুর বধের প্রতিশোধ নেবেন, আর দেবী অসুরদের বধ করে দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত করবেন স্বর্গ রাজ্যে। সুগ্রীব গিয়ে দেবীর উত্তর জানাতেই শুম্ভ ও নিশুম্ভ রেগে অস্থির হলেন। ধূম্রলোচনকে ডেকে বললেন, তুমি সসৈন্যে গিয়ে তার কেশাকর্ষণ করে এখানে নিয়ে এস।

ধূম্রলোচন ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে হিমাচলে এল দেবীকে ধরে আনবার জন্য। কিন্তু দেবী তার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন না। তাঁর এক হুঙ্কারেই ধূম্রলোচন দগ্ধ হয়ে গেল, আর তার সৈন্যেরা ছারখার হয়ে গেল দেবীর বাহন সিংহের আক্রমণে।

এই পরাজয়ের খবর যখন শুম্ভ ও নিশুম্ভের কাছে পৌঁছল তখন তাঁরা ক্রোধে অধীর হয়ে চণ্ড ও মুণ্ডকে ডেকে বললেন, এবারে তোমরা যাও বিপুল বাহিনী নিয়ে। বেঁধে কেশাকর্ষণ করে তাকে এখানে আনো। প্রথমে তার সিংহকে মারো, তারপর তাকে বাঁধো। যদি প্রয়োজন হয় তবে তাকে হত্যা করতেও দ্বিধা কোরো না।

রাজার এই আদেশ নিয়ে চণ্ড ও মুণ্ড ধাবিত হল।

আবার যুদ্ধ। আবার পরাজয়। দেবীর হাতে চণ্ড ও মুণ্ড নিহত হল। দেবীর নাম হল চামুণ্ডা।

এবারে এলেন রক্তবীজ। এই রক্তবীজের কথা আগেই বলেছি। মহিষাসুরের পিতা রম্ভ মৃত্যুর পরে রক্তবীজরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার এক ফোঁটা রক্ত ভূমিতে পড়লে আর একটি রক্তবীজের জন্ম হয়। রক্তবীজ একা আসেন নি, শুম্ভের আদেশে কম্বু কোটিবীর্য ধৌম্র প্রভৃতি নানা বংশের অগণিত সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র কার্তিক প্রভৃতি দেবতারাও তাঁদের শক্তি দেবীর কাছে পাঠালেন। তারপর ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল।

গুরুজী বললেন: রক্তবীজের বিক্রম দেখে দেবতারাও ভয় পেলেন। শেষ পর্যন্ত দেবী কালীকে বললেন মুখব্যাদান করে রক্তবীজের সমস্ত রক্ত পান করতে। দেবী তাকে আঘাত করতে লাগলেন, রক্তবীজের রক্ত মাটিতে আর পড়ল না। কালী সমস্ত রক্ত পান করলেন। রক্তশূন্য হয়ে রক্তবীজের মৃত্যু হল।

তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন নিশুম্ভ ও শুম্ভ। এই দুই মহাবীর এসে দাঁড়াতেই আবার যুদ্ধ জমে উঠল। যুদ্ধের বর্ণনা যার ভাল লাগে, তাকে চণ্ডী পড়তে হবে। এই দেবী মাহাত্ম্যে যুদ্ধের বর্ণনাই সব চেয়ে প্রধান হয়ে আছে। অসুর কোন্ অস্ত্রে দেবীকে আঘাত করলেন, আর দেবী কোন্ অস্ত্রে তা সংবরণ করলেন, তার প্রাণবন্ত বিবরণ আছে। কালী শিবদূতী প্রভৃতি শক্তিরা অসুর সেনার সঙ্গে যুদ্ধ

করতে লাগলেন। আর দেবীর আঘাতে নিশুম্ভ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তারপর শুম্ভ এলেন এগিয়ে।

মূর্ছা ভঙ্গের পর নিশুম্ভ আবার উঠে দাঁড়িয়ে দেবীকে আক্রমণ করলেন। দেবী নিশুম্ভের বুকে শূলের আঘাত করলেন। তখনই তার বুক থেকে এক মহাপরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত হল, কিন্তু দেবী খড়্গের আঘাতে তার শিরশ্ছেদ করলেন।

ভ্রাতার মৃত্যুতে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে শুম্ভ দেবীর সম্মুখীন হলেন। বললেন, দুর্গা, বৃথা গর্ব কোরো না। তোমাদের নিজের বল নেই, তুমি যুদ্ধ করছ তোমার সহকারী স্ত্রীলোকদের বলে, তার জন্য তোমার অহংকার কিসের!

দেবী বললেন, জগতে আমি একাই বিহার করি, আর এ সমস্তই আমার বিভূতি। এই দেখ, এঁরা সকলে আমাতেই আবার প্রবেশ করছেন।

এই কথা বলতেই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি স্ত্রী শক্তি দেবীর শরীরে বিলীন হয়ে গেলেন। তারপর দেবী একা যুদ্ধ করলেন শুম্ভের সঙ্গে।

শুধু পৃথিবীতে নয়, নিরালম্ব আকাশেও যুদ্ধ হল। দেবী শুম্ভকে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন, তারপর শূলের আঘাতে তাঁকে বধ করলেন।

গুরুজী বললেন ঃ দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী শেষ হয়েছে এই কাহিনীর পরে।

আমাদের অধিবেশনও এইখানে শেষ হল।



পরদিন দুপুর বেলায় শকুন্তলাদি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি যথারীতি কাগজ পেনসিল নিয়ে বসেছিলাম, আর আকাশ পাতাল ভাবছিলাম। অসুরের কথার ভূমিকা আমার লেখা হয়ে গেছে। তা পড়ে মনে হল যে নিতান্তই ভুল লিখেছি। দেবতাদের চেয়ে অসুররা আমার লেখায় বড় হয়ে উঠছে। প্রাচীন আর্যদের মধ্যে দুর্বল যারা তারা দেবতা, আর যারা বলশালী তারাই অসুর। দেবতারা সোমপায়ী ও পশুমেধকারী বলে অসুররা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল।

তারপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যদি চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করি, তাহলে দেবতাদের দুর্বলতার কথাই প্রমাণিত হয়। মহিষাসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধের জন্য দেবতারা দেবীকে আহ্বান করেছিলেন, নিজেরা সে যুদ্ধে যোগ দেন নি। আর এই অসুররা এমন কোন দুষ্কর্ম করে নি যার জন্যে তাদের নিন্দা করতে পারি।

এই সব ভাবনাতে মন যখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল, তখুনি শকুন্তলাদির ডাক এল। তাড়াতাড়ি আমি খাতা বন্ধ করে শকুন্তলাদির ঘরে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম।

সুপ্তি আমাকে ডাকতে এসেছিল। কিন্তু আমাকে ডেকে সে ফিরে যায় নি। দরজার বাহিরে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। আমাকে বেরোতে দেখেই চুপিচুপি বলল: সামলাও এবারে।

সুপ্তি যে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল, তা আমি বুঝতে পারি নি। হঠাৎ তার কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম। তারপর সামলে নিয়ে বললাম: কী সামলাব?

সুপ্তি বলল: গুরুজী সব কথা জেনে ফেলেছেন।

কী জেনেছেন?

খাতায় আজকাল কবিতা লিখছ তো!

বললাম: কবিতা চেম্বুলু লিখছে।

সত্যি নাকি!

শকুন্তলাদির ঘরের দিকে যেতে যেতে বললাম: খুব সুন্দর কবিতা, ওদের নিজেদের ভাষায় লিখছে, পড়ে আমাকে মানে বুঝিয়ে দিয়েছে। শুনবে নাকি?

সুপ্তি বলল: বল।

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম:

‘কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।’

অন্য জনা কে বলতো?

বাঙলা কবিতা সুপ্তি বোঝে নি, বুঝেছিল আমার হিন্দী প্রশ্নটা। তাই আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি তাকে হিন্দীতে বুঝিয়ে বললাম: এইবারে অন্য জন কে তাই বল।

সুপ্তি বলল: লক্ষ্মী।

বললাম: হল না।

তবে কে?

খুব গম্ভীরভাবে বললাম : চেম্বলু লিখেছে অমৃতের ভাণ্ড হাতে নিয়ে উঠেছিল স্বপ্তি।

পালাবার সময় স্বপ্তি বলে গেল : দাঁড়াও, গুরুজীকে আমি বলে দিচ্ছি।

ঘরের ভিতর শকুন্তলাদি একখানা মোটা বই পড়ছিলেন। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন। অন্য ধারে আমি মিসেস খুরানাকেও দেখতে পেলাম। তিনি একখানা ছোট আয়নায় মুখ দেখছিলেন। একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আমি শকুন্তলাদিকে জিজ্ঞাসা করলাম : আমাকে ডেকেছেন ?

শকুন্তলাদি ভাবলেন একটুখানি, তারপর বললেন : একবার খোঁজ করেছিলাম বইকি।

আমি তার পরের কথা শোনবার জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

শকুন্তলাদি বললেন : কথা এমন কিছু নয়, জানতে চেয়েছিলাম কী করছ! মানে, পড়ছ, না লিখছ এখন ?

বললাম : দুটোর কোনটাই না।

কেন ?

লেখবার জন্য বসেছিলাম, কিন্তু কী লিখব ভেবে পাচ্ছি না।

শকুন্তলাদি আমাকে বসতে বললেন।

আমি বসবার পরে বললেন : অসুরের কথা লিখতে কী অসুবিধা হচ্ছে ?

বললাম : খুব অসুবিধা। আমাদের সংস্কারের সঙ্গে অসুরের কথা মিলছে না।

সে আবার কী !

খাতা পেনসিল নিয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম। গুরুজীর কাছে যে অসুরদের কথা শুনলাম, তাদের কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি নে। নিষ্ঠুর অত্যাচারী অধার্মিক না বললে যেন অসুর বলে মানায় না। অথচ—

শকুন্তলাদি বললেন : যা শুনেছ, তুমি তাই লিখবে।

বললাম : তা লিখতে গেলে যে দেবতারা ছোট হয়ে যান। বিষ্ণু ছলনা করে মধু কৈটভকে বধ করেছেন, মহিষাসুরকে আমার পরম ধার্মিক বলে মনে হয়েছে, আর শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে দেবতাদের মনে হয়েছে কাপুরুষ। ধূম্রলোচন চণ্ড মুণ্ড বা রক্তবীজের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও তাঁরা নামেন নি।

শকুন্তলাদি বললেন : তাহলেই দেখ, আমাদের বেদের কথাই প্রমাণিত হচ্ছে। সৃষ্টির প্রথম যুগে দেবতায় ও অসুরে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এই কথা মেনে

নিয়ে তুমি লিখতে আরম্ভ কর, দেখবে আর কোন ভাবনা নেই।

বললাম: একটা কথা আমার মনে হয়েছে যে পুরাণে দেবতাদের বড করে দেখাবার একটা চেষ্টা আছে।

কিন্তু তাঁদের কলঙ্কের কথা গোপন করার চেষ্টা পুরাণকার করেন নি।

ইন্দ্রের কথা চন্দ্রের কথা অগ্নির কথা আমার মনে পড়ল। কাজেই আমি কোন প্রতিবাদ করতে পারলাম না।

শকুন্তলাদি বললেন: সে সব কাহিনীও তো আমরা শুনেছি। বিচারের ভার তোমার পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিলেই ভাল করবে।

বললাম: কিছু না লিখলেই তো সব চেয়ে ভাল হয়!

শকুন্তলাদি হেসে বললেন: গুরুজী রাগ করবেন।

মিসেস খুরানার দিকে আমার চোখ পড়ল। শকুন্তলাদির মুখে হাসি দেখে তিনি ঠোঁট ওল্টালেন। আমি তাঁর মনোভাব জানি বলে কোন কথা বললাম না।

শকুন্তলাদি কিছুই দেখতে পান নি। বললেন: আর না লিখলেই বা চলবে কেন, কাউকে তো এ কাজ করতে হবে।

বললাম: বেশ আবদার আপনাদের। যে জানে না কিছু, তাকে দিয়েই জ্ঞানের কথা লেখাবেন। কেন, আপনি লিখুন না!

বেশ কথা: শকুন্তলাদি আবার হাসলেন: আমার তো সবই জানা কথা, লিখতেই শুধু বাকি।

ঘরের অন্য ধারে মিসেস খুরানা আবার ঠোঁট ওল্টালেন। শকুন্তলাদি আমার দিকে চেয়ে আছেন, মিসেস খুরানাকে দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু মিসেস খুরানা দুজনকেই দেখছেন পাশ ফিরে, আর মাঝে মাঝে আয়নায় মুখ দেখছেন। প্রসাধন তিনি ভালবাসেন। বিকেলবেলায় যখন সেজেগুজে বেড়াতে বার হন, তখন আশ্রমবাসিনীর মতো মনে হয় না। এই নিয়ে কেউ কেউ কঠিন মন্তব্যও করেন। কিন্তু আমি শকুন্তলাদির কথার উত্তর দিলাম: আমার চেয়ে যে বেশি জানেন, তাতে তো সন্দেহ নেই!

শকুন্তলাদি বললেন: সন্দেহ তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে।

আমি যে কিছুই জানি না, তাতেও আমার কোন সন্দেহ নেই।

সহসা শকুন্তলাদির মুখ কঠিন হল, বললেন: থাক বাজে কথা। এবারে তুমি লিখতে যাও।

আমি উঠে পড়তে এক মুহূর্তও দেরি করলাম না। শকুন্তলাদির মুখে আমি সেই দৃঢ়তা দেখলাম, দেরি করলে তিনি আমায় তাড়িয়ে দেবেন।

সারা দিন আমি এক রকমের অস্থিরতা বোধ করেছিলাম। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চেম্বলু যখন আমাকে জাগিয়ে দিল তখন দিনের আলো নিবে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে আর দেরি ছিল না।

চেম্বলু বলল : তোমার আজ কী হয়েছে বলতো ?

তৎপর ভাবে উত্তর দিলাম : কিছু হয় নি তো।

স্বপ্তিকে কী বলেছ ?

আমি !

তুমি ছাড়া আর কার কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করব !

একটু চিন্তা করে বললাম : মনে পডছে না।

চেম্বলু বলল : তা মনে পড়বে কেন ! নিজের কথা অন্যের নামে চালাতে বেশ লাগে, কী বল !

আমি কোন উত্তর না দিয়ে মুখ হাত ধুতে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। চেম্বলু আমার হাত টেনে ধরে বলল : উত্তর না দিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

বললাম : তুমি কী শুনেছ তাই বল।

চেম্বলু এবারে সরাসরি আক্রমণ করল : আমি কবিতা লিখি, না ! আর ঐ সব কবিতা !

এবার আমার সব কথা মনে পডে গেল। হেসে বললাম : আজকাল তো তুমি শুয়ে শুয়ে কবিতা ভাবছ !

কী ?

মানে, মানুষ কি আর চুপ করে শুয়ে থাকতে পারে, না ঘুমোতে পারে সারাক্ষণ ? তাই বলছিলাম যে তুমি নিশ্চয়ই মনে মনে কবিতা লিখছ।

চেম্বলুর রাগ পড়ল না, বলল : মনে মনে আমি কবিতা লিখছি ! আর আমার খাতা থেকে তাই তুমি সবাইকে পড়ে শোনাচ্ছ !

বাহিরে স্বপ্তির হাসি শোনা গেল। হাসতে হাসতে সে সরে গেল।

চেম্বলু আমার মুখের দিকে তাকাল। আর আমি হাসলাম তার অপ্রতিভ ভাব দেখে।

নিজেকে সামলে নিয়ে চেম্বলু বলল : বিকেলবেলায় মিসেস খুরানা তোমাকে ডাকতে এসেছিল। তুমি ঘুমোচ্ছ দেখে ফিরে গেছে।

তারপর ?

তারপর আর কী ! একা একাই বেড়াতে গেছে।

তুমি তার সঙ্গে গেলে না কেন ?

চেন্নুলু বলল : ঘুম থেকে উঠে তুমি রাগ করবে বলে।

কিন্তু এখন জাগিয়ে দাও নি বলে যদি রাগ করি ?

চেন্নুলু বলল : এ রাগ সামলানো যাবে।

তার পরেই জিজ্ঞাসা করল : আচ্ছা বলতো, ঐ মহিলা রোজ তোমার সঙ্গে কী গল্প করে ?

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম : তোমাদের সম্বন্ধেই আলোচনা হয়।

চেন্নুলু বলল : আমি ভেবেছিলাম, নিজেদের সম্বন্ধেই কথা বল।

তারপর কী একটা কথা মনে হতেই বলল : আচ্ছা, মিসেস খুরানার স্বামী কী করেন ?

জানি নে।

ভদ্রলোক থাকেন কোথায় ?

তাও জানি নে।

চেন্নুলু বলল : স্বামীকে ফেলে স্ত্রী একা এসেছে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

কিসের সন্দেহ ?

নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে।

তা থাকতেও পারে !

বিস্ময়ে চেন্নুলু লাফিয়ে উঠে বলল : থাকতে পারে !

বললাম : না থাকলে আর এখানে এসেছে কেন !

আমার এই উত্তর শুনে সে হতাশ হল। বলল : যাও, হাত মুখ ধুয়ে এস। গুরুজীর সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ হতে আর দেরি নেই।

আমি আর দেরি করলাম না। উপাসনার মন্দিরে আমাদের এখনই সমবেত হতে হবে। আজ আমরা নতুন কোন অসুরের কথা শুনব।



উপাসনার মন্দিরে এসে গুরুজী নূতন গল্প শুরু করলেন, বললেন : এক দিন বেড়াতে বেড়াতে সনক সনন্দাদি ঋষি বৈকুণ্ঠের দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। অন্তঃপুরে বিষ্ণু তখন বিশ্রাম করছিলেন।

সহসা গুরুজীর মুখে বিষ্ণু ও ঋষিদের কথা শুনে আমার মনে হল যে তিনি তাঁর গল্পের খেই হারিয়ে ফেলেছেন। অসুরের কথা বলতে বলতে দেবতা ও ঋষিদের কথায় উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু সবাই নীরবে রইলেন, কেউ কোন কথা কইলেন না।

গুরুজী বললেন ঃ দিগম্বর এই ঋষিরা পাঁচ ছয় বছরের বালকের মতো দেখতে। দ্বাররক্ষীরা তাঁদের বাধা দিয়ে বললেন, প্রবেশ নিষেধ।

ঋষিরা ক্ষেপে উঠলেন, এত বড স্পর্ধা!

দ্বাররক্ষীরা বললেন, আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করছি।

ক্রুদ্ধ ঋষিরা বললেন, আশ্চর্য, বিষ্ণুর এত নিকটে বাস করেও তোমাদের চিত্তের রজস্তমোমল নির্মল হয় নি! তোমরা বিষ্ণুর দ্বাররক্ষী হবার উপযুক্ত নও। আমরা অভিশাপ দিচ্ছি, তোমরা পৃথিবীতে অসুর হয়ে জন্মাবে।

অভিশপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা স্বর্গভ্রষ্ট হলেন। কিন্তু তাঁদের পতন দেখে ঋষিদের রাগ অন্তর্হিত হয়ে গেল, ক্ষমা করলেন তাঁদের, বললেন, বেশি নয়, তিন জন্ম তোমরা কষ্ট পাবে, তারপর আবার এখানে ফিরে আসবে।

গুরুজী বললেন ঃ এই হল বিষ্ণুর দ্বাররক্ষী জয় বিজয়ের গল্প। সত্য যুগে তাঁরা হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ হয়ে জন্মালেন, ত্রেতায় রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, আর দ্বাপরে শিশুপাল ও দন্তবক্র।

এই জয় বিজয়ের কাহিনী আমি শৈশবে শুনেছিলাম। সে একটু অন্য রকম। জয় বিজয় দুই ভাই। দুয়ার ছেড়ে না দেওয়ার অপরাধে সনকাদি ঋষিরা যখন তাঁদের শাপ দিলেন, তখন তাঁরা সকাতরে ঋষিদের অনুনয় করেছিলেন। ঋষিরা এই বিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, অভিশাপ তো ব্যর্থ হবে না, তবে মুক্তির একটা উপায় হতে পারে। পৃথিবীতে ঈশ্বরকে যদি মিত্র ভাবে ভজনা কর, তাহলে সাত জন্মের পরে উদ্ধার হবে, আর বৈরী ভাবে ভজনা করলে তিন জন্মের পরেই এখানে আসতে পারবে।

জয় বিজয় বললেন, আমাদের আশু মুক্তি চাই। ঈশ্বরকে আমরা শত্রু ভাবেই ভজনা করব।

তাইতেই এঁরা হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষ রাবণ-কুম্ভকর্ণ ও শিশুপাল-দন্তবক্র রূপে পৃথিবীতে জন্মালেন আর বিষ্ণু নানা রূপে এঁদের বধ করলেন।

গুরুজী বললেন ঃ হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবত ও প্রায় সকল পুরাণেই আছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভের মতো এঁরাও সত্য যুগের দৈত্য।

তারপর তাউজীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ শুম্ভ ও নিশুম্ভকে আমি বোধহয়

অসুর বলেছি। তাঁরা দনুর পুত্র বলে দানব বলা উচিত ছিল। কিন্তু দেবী মাহাত্ম্যে তাঁদের অসুর বলা হয়েছে বলে আমিও অসুর বলেছি। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু দৈত্য, তাঁরা দিতির পুত্র।

এঁদের জন্মের ইতিহাস আমাদের জানা আছে। এই ইতিহাস সত্য বলে মেনে নিলে মানুষে আর দৈত্যে কোন প্রভেদ থাকে না।

এ কথা শুনে আমরা আশ্চর্য হলাম। মানুষে আর দৈত্যে কোন প্রভেদ নেই, এ আবার কেমন কথা! এই মন্তব্যে আমাদের আজন্ম সংস্কারে যেন আঘাত পড়ছে।

গুরুজী বললেন: মহর্ষি কশ্যপ ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির পুত্র, অন্য এক মানস-পুত্র দক্ষ প্রজাপতির তেরটি কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করেছিলেন। দিতি এই কন্যাদের অন্যতমা। সৃষ্টির আদি যুগে এই যে মিলন হয়েছিল তখন ঋষির সন্তানদের ঋষি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তপস্যায় অকৃতকার্য হলে আমরা তাদের সাধারণ ব্রাহ্মণ বলতে পারতাম। কিন্তু দুই ঋষির পুত্র কন্যার মিলনের ফলে দৈত্য দানবের জন্ম হয়েছিল শুনে স্বভাবতই বিস্ময় জাগে। এরই কৈফিয়ৎ দেবার জন্য পুরাণকার একটি কাহিনী রচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন।

এই পর্যন্ত বলে গুরুজী একটু থামলেন। তারপর বললেন: পুরান রচয়িতারা ধর্মতত্ত্বের কথার সঙ্গে অনেক অশ্লীল কাহিনী এমন অবলীলাক্রমে বলে গেছেন যে তা লেখবার সময় তাঁদের কোন ভাবান্তর হয়েছিল বলে আমরা ভাবতেই পারি না। কিন্তু আমরা যখন তা বলবার চেষ্টা করি তখন বাধা পাই। এই প্রসঙ্গে বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবের কথা আমার মনে পড়ে। এই জিতেন্দ্রিয় ঋষির কথা মহাভারতে আছে। হিমালয়ে মন্দাকিনী তীরে তিনি যখন বাস করতেন তখন অপ্সরারা তাঁর উপস্থিতির কথা বিস্মৃত হয়ে নগ্ন দেহে ক্রীড়া করত। তিনি যখন লোকান্তরে অন্তর্হিত হলেন তখন তাঁর বৃদ্ধ পিতা বেদব্যাস এসেছিলেন পুত্রের সাধনার স্থলে। অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে নগ্ন অপ্সরারা সেখানে ক্রীড়া করছিল। সহসা এই বৃদ্ধ মহর্ষিকে দেখে তারা ত্রস্ত ও লজ্জিত হয়ে উঠল। কেউ জলে লীন হল, কেউ গুল্মের আড়ালে লুকলো, কেউ বা তার বসনের জন্য ত্বরান্বিত হল। বেদব্যাস যুগপৎ লজ্জিত ও প্রীত হলেন। তাঁর যুবক পুত্র কত নির্বিকার ছিল যে এই অপ্সরাগণ কোন দিন তাঁর উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করেনি, অথচ তাঁর মতো বৃদ্ধকে দেখে এরা লজ্জা পাচ্ছে।

এমনই হয়। পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই কোন ঘটনা বা কাহিনীর শ্লীলতার বিচার হয়। গুরুজী কেন এই কাহিনী বললেন, আমি তা অনুমান করতে

পেরেছিলাম। এমন কিছু হয়তো বলবার প্রয়োজন হয়েছে যা বলতে তিনি দ্বিধা করছেন।

সবাই এ কথা বুঝেছিলেন। তাউজী বললেন: আপনি কোন দ্বিধা করবেন না। বয়সে অনেক নবীন হলেও বুদ্ধি কারও অপরিণত নয়। অসঙ্কোচে আপনি সব কথা বলতে পারেন।

গুরুজী যেন অপ্রতিভ হন নি এমনি ভাবে বললেন: তা বলতেই হবে। আর এ কোন অশাস্ত্রীয় কথা নয়। বরং এ রকম কথা বাদ দিলে পুরাণের প্রতি অবিচার করা হবে। সুস্থ জীবনের কথাই পুরাণকার অত্যন্ত সহজ ভাবে বলেছেন।

তাউজী আর কোন কথা বললেন না।

গুরুজী থামলেন না, বললেন: কশ্যপের পত্নী দিতির কথা। এক দিন সায়াহ্নে তিনি স্বামীর নিকটে এলেন। তখনও তাঁর সন্তান হয় নি, বলবান পুত্র লাভের কামনা তাঁর মনে। সেই কামনার কথা তিনি স্বামীকে জানালেন।

মহর্ষি কশ্যপ তাঁর মনোরথ পূর্ণ করলেন। তার পরে বিপদের কথা বললেন পত্নীকে, তোমার চিত্ত অপবিত্র এবং কামপরতন্ত্রা তুমি। সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বলে তোমার দুটি অধম পুত্র হবে।

কশ্যপ এই অধম পুত্রের বর্ণনাও দিয়েছিলেন। তারা অত্যাচারী হবে এবং যখন তারা নিরপরাধ প্রাণীর উপর অত্যাচার ও স্ত্রী নিগ্রহ করবে, তখন বিষ্ণু এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তাদের বধ করবেন।

ঠিক এই সময় আমার একটি পুরনো কথা মনে পড়ল। দেবতার কথায় গুরুজী বলেছিলেন যে অদিতির গর্ভে কশ্যপের যে সব পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, বিষ্ণু তাঁদের অন্যতম। সৃষ্টির আদিতে আমরা এক বিষ্ণুকে অনন্ত শয়নে দেখি, তাঁর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। তাতে মহেশ্বরের জন্মকথা নেই। কশ্যপ ব্রহ্মার পৌত্র, আবার এই কশ্যপের এক পুত্রের নাম বিষ্ণু। অদিতির গর্ভে যে দেবতাদের জন্ম, এই বিষ্ণুও তাঁদের একজন। আমার মনে হল যে এই ঘটনাটা একটু অন্য রকম। অদিতির গর্ভে বিষ্ণু বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা করার অবকাশ পেলুম না। গুরুজী বলছিলেন: কশ্যপের এই কথা শুনে দিতি বড় বিষণ্ণ হলেন, তাঁর ক্ষোভের আর অন্ত রইল না। তাই দেখে কশ্যপ বললেন, দুঃখ কোরো না, তোমার এক পৌত্র হবে সাধু ধর্মাত্মা। তার পুণ্যে তোমরা পবিত্র হবে। স্বামীর এই কথা শুনে দিতি কতকটা আশ্বস্ত হলেন।

একশো বছর পরে তাঁর দুটি যমজ পুত্র হল। তাদের জন্ম সময়ে স্বর্গ মর্ত্য পাতালে নানা অমঙ্গলের লক্ষণ দেখা দিল। সমুদ্র বিক্ষুব্ধ ও বাতাস দুস্পর্শ হল, চারি দিক আচ্ছন্ন হল নিবিড় ঘনঘটায়। শুধু বজ্রপাত নয়, উল্কাপাত হল আকাশ থেকে। শনি মঙ্গল প্রভৃতি ক্রুর গ্রহরা দীপ্ত হয়ে বৃহস্পতি শুক্র প্রভৃতি শুভ গ্রহদের অতিক্রম করে গেল, তারপর বক্র গতিতে আবার ফিরে এসে পরস্পর যুদ্ধ শুরু করল। পৃথিবী কাঁপতে লাগল, শৃগাল ও পেঁচার রবে চারি দিক পূর্ণ হয়ে গেল। সবাই ভাবল, এ আবার কী!

সনকাদি ঋষিরাই শুধু এর কারণ জানতেন, আর জানতেন কশ্যপ। তিনি এসে উপস্থিত হলেন এবং যে পুত্রটি আগে জন্মেছিল তার নাম দিলেন হিরণ্যকশিপু ও অনুজের নাম দিলেন হিরণ্যাক্ষ।

গুরুজী বললেন: এই যমজ ভাই-এর গল্প সবারই জানা। যা জানা নয়, তা হল এদের অপরাধের কথা। এরা কার উপর কী অত্যাচার করেছে সে কথা পুরাণকার লিখে যান নি, তাই আমরাও জানি না। হিরণ্যকশিপু তাঁর পুত্র প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার করেছেন সত্য, কিন্তু তার আগের ঘটনা দিয়ে হিরণ্যকশিপুর চরিত্র বিচার করা উচিত। বরাহ অবতারে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন বলেই হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে শত্রু ভাবতেন। হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতৃপ্রেম এখানে লক্ষণীয়। ভ্রাতাকে হারিয়ে হিরণ্যকশিপুর চরিত্র যেন রাতারাতি পালটে গিয়েছিল।

কশ্যপের কাছে দিতি বলবান পুত্র চেয়েছিলেন। তাঁর সে প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল। দুই ভ্রাতারই পাষাণের মতো কঠিন দেহ পর্বতের মতো প্রকাণ্ড হল। হিরণ্যবৎ পীতে অক্ষিণী যস্য সে হিরণ্যাক্ষ। ব্রহ্মার বরে দুর্ধর্ষ হয়ে সে যুদ্ধ করবার জন্য গৃহ থেকে বহির্গত হল।

হিরণ্যাক্ষ তখন সাবালক, তাঁর বিবাহ হয়েছে। ভানু তাঁর স্ত্রী, আর পুত্রদের নাম শকুনি শম্বর ধৃষ্টি ভূতসন্তাপন বৃক কালনাভ মহানাভ হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ। এরা সবাই হিরণ্যকশিপুর অত্যন্ত প্রিয়। কত প্রিয় তার প্রমাণ পরে পাওয়া যাবে।

হিরণ্যাক্ষের এই যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা আছে পুরাণে। তাঁর দুই পায়ে সোনার নূপুর, গলায় বৈজয়ন্তী মালা আর স্কন্ধে বিরাট গদা। হিরণ্যাক্ষ নিরঙ্কুশ অকুতোভয় ও বরগর্বিত। রাজাদের যেমন মৃগয়ার লোভ, তেমনি যুদ্ধের লোভে তিনি পৃথিবী থেকে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু স্বর্গ তখন শূন্য। দেবরাজ ইন্দ্র নেই, ভয়ে দেবতারা স্বর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।

কোন দিকে কাউকে দেখতে না পেয়ে হিরণ্যাক্ষ গর্জন করলেন খানিকক্ষণ, তারপর হতাশ হয়ে জলক্রীড়ার জন্য সমুদ্রের জলে এসে নামলেন। স্নানের সময় বরুণের বিভাবরী পুরী দেখতে পেয়ে তাঁর ভাল লাগল। সেইখানেই রইলেন কিছু দিন। ভয়ে বরুণ আত্মগোপন করে রইলেন।

সহসা এক দিন হিরণ্যাক্ষ বরুণকে দেখতে পেয়ে খুশী হলেন, বললেন, যুদ্ধং দেহি।

বরুণ বুদ্ধিমান, তখনই আত্মসমর্পণ করে বললেন, হে অসুর শ্রেষ্ঠ, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধের যোগ্য নই। আপনি অদ্বিতীয় বীর, একমাত্র বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করেই আপনার যুদ্ধের বাসনা কিছু তৃপ্ত হবে।

কিন্তু বিষ্ণু কোথায়?

নারদ মুনি সংবাদ দিলেন, বিষ্ণু এখন রসাতলে পৃথিবী উদ্ধারের জন্য গেছেন। রসাতলে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

গুরুজী বললেন: এই বরাহ অবতারের কাহিনী ভাগবতে আছে। পৃথিবী তখন প্রলয় পয়োধিজলে নিমগ্ন। ব্রহ্মা এই পৃথিবীকে উদ্ধারের কথা যখন চিন্তা করছেন, তখন তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে একটি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বরাহ পোত নির্গত হল। ক্রমে তা বর্ধিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করল। বিষ্ণু এই বরাহ রূপে পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য রসাতলে প্রবেশ করলেন। যখন তিনি তাঁর দন্তে পৃথিবীকে ধারণ করে রসাতল থেকে নির্গত হচ্ছিলেন, তখনই তাঁর দেখা হল হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে। হিরণ্যাক্ষ হেসে বললেন: কে বিষ্ণু? এ যে একটি জলচর বরাহ!

কিন্তু বরাহের দুই চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তারপর দুজনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। শেষ পর্যন্ত বরাহ তাঁর দন্তে হিরণ্যাক্ষকে বিদীর্ণ করে সুদর্শন চক্রে তাঁকে বধ করলেন।

হিরণ্যকশিপু অনুজের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকে অধীর হলেন, মনে মনে সংকল্প করলেন যে বরাহরূপী বিষ্ণুকে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে। রক্তের বদলে রক্ত। যে কোন প্রকারেই হোক বিষ্ণুকে হত্যা করতে পারলেই তাঁর শোকের উপশম হবে।

প্রথমে হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার শ্রাদ্ধ শান্তি করলেন। তারপর মাতা ও ভ্রাতৃ-বধূকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর সংকল্পের কথা জানালেন। কয়াধু তাঁর স্ত্রী, হ্লাদ সংহ্লাদ অনুহ্লাদ ও প্রহ্লাদ বা প্রহ্লাদ তাঁর চার পুত্র। সকলের নিকট বিদায় নিয়ে তিনি তপস্যা করতে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁকে অজর অমর অজেয় রাজা হতে হবে, দেবতাদের পদানত করে বিষ্ণুকে বধ করতে হবে।

হিরণ্যকশিপু মন্দর পর্বতের কন্দরে উপস্থিত হয়ে তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রখর সূর্যের ন্যায় তাঁর দেহ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। পূর্বে কোন ঋষিও এমন কঠোর তপস্যা করেন নি।

পুরাণকার হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের কথাও লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পরে তিনি নাকি তাঁর অনুচরদের আদেশ করেছিলেন যে যজ্ঞ ও ব্রতাদি রত মানুষদের বধ কর। তাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু বিষ্ণু ও দেবতাদের জন্য তারা যজ্ঞ করে, এই তাদের অপরাধ। মানুষেরা যাগযজ্ঞ বন্ধ করলে বিষ্ণু ও দেবতারা সব দুর্বল হয়ে পড়বে। হিরণ্যকশিপুর এই আদেশে তাঁর অনুচরেরা মানুষের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। মানুষ যজ্ঞ বন্ধ করতেই দেবতারা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে অলক্ষিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এই হল হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের কাহিনী। এখানে আমরা মানুষের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ দেখি না, বিদ্বেষ দেখি তাঁর ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণুর প্রতি। দেবতারা তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই, কিন্তু অগ্রজ বলেই তাঁরা স্বর্গের অধিকারী। হিরণ্যাক্ষ শক্তি সঞ্চয় করে স্বর্গে গিয়েছিলেন, আর ভয়ে দেবতারা পালিয়ে গিয়েছিলেন। এইবারে হিরণ্যকশিপু অপরিসীম শক্তির অধিকারী হবার জন্য কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর দেহ বল্মীক স্তূপে ঢেকে গেছে, দংশ তাঁর দেহ ভক্ষণ করেছে, সধূম অগ্নি নির্গত হচ্ছে মস্তক থেকে। এখন শুধু তাঁর দেহের কঙ্কাল ও প্রাণমাত্র অবশিষ্ট, কিন্তু তবু তাঁর চেতনা নেই।

এই সময়ে ব্রহ্মা এসে তাঁকে দর্শন দিলেন। বললেন, বৎস, তোমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। তোমার তপস্যা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। অতীতে কোন ঋষিরও এমন ধৈর্য ও সমাধি আমি দেখি নি, ভবিষ্যতেও কেউ এ রকম পারবে না। এখন তুমি ক্ষান্ত হয়ে বর প্রার্থনা কর।

বলে ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে হিরণ্যকশিপুর দেহে ছিটিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর শরীর আবার সবল সুন্দর হয়ে উঠল।

ব্রহ্মাকে প্রণাম করে হিরণ্যকশিপু বললেন, ভগবান, আপনি আমাকে এই বর দিন যে আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণীর হাতে আমার মৃত্যু হবে না। অভ্যন্তরে বা বাহিরে দিবসে বা রাত্রে ভূমিতে বা আকাশে আপনার সৃষ্ট ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীর হাতেও যেন আমার মৃত্যু না হয়। আমি যেন সকল দেহীর উপর একাধিপত্য করতে পারি।

ব্রহ্মা তাঁর তপস্যায় এমনই তুষ্ট হয়েছিলেন যে পূর্বাপর বিবেচনা না করেই বললেন, তথাস্তু।

মন্দর পর্বত থেকে হিরণ্যকশিপু দুর্ধর্ষ হয়ে ফিরে এলেন। প্রথমেই তিনি সোনার বপু ধারণ করে সকল প্রাণীর অধিপতিদের জয় করলেন। বিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষ তাঁর এতটুকু কমে নি, বিশ্বজয় করেই তিনি স্বর্গ রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেবতাদের জয় করে তিনি নিজেই ইন্দ্র হয়ে বসলেন এবং দেবতারা অনন্যোপায় হয়ে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ছাড়া ত্রিভুবনের আর সকলে তাঁর উপাসনা করতে লাগল। ঋষিরা তাঁর স্তব করতে লাগল, আর ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থেরা তাঁরই নামে যজ্ঞানুষ্ঠানে রত হল। হিরণ্যকশিপু সমস্ত যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করতে লাগলেন, আর দেবতারা বঞ্চিত হলেন তাঁদের ভাগে। দেবতাদের নামে যজ্ঞ করতে আর কারও সাহস রইল না।

হিরণ্যকশিপুর প্রভাবে সপ্ত দ্বীপের জমিতে বিনা কর্ষণে শস্য জন্মাতে লাগল। তাঁর ইচ্ছা মতো গাভী দুধ দিতে আরম্ভ করল। তিনি যখন অমরাবতীতে ইন্দ্রের সভায় বসতেন, তখন তাঁর যশোগান করত গন্ধর্ব তুম্বরু ও বিশ্বাবসু, অপ্সরা ও বিদ্যাধররা নৃত্য গীতে তাঁর মনোরঞ্জন করত।

গুরুজী বললেন : হিরণ্যকশিপু কার উপর অত্যাচার করেছিলেন, পুরাণে সে কথা নেই। বরং মনে হবে যে তাঁর সুশাসনে কারও কোন দুঃখ ছিল না। হিরণ্যকশিপুর ছিদ্রান্বেষণ করে পুরাণকার বললেন, অনেক কাল গত হবার পর ঐশ্বর্যমত্ত হিরণ্যকশিপু শাস্ত্রমর্যাদা উল্লঙ্ঘন করলেন এবং তাঁর উগ্র দণ্ডে সব লোকের উদ্বেগ জন্মাল। তাই দেখে দেবতারা গিয়ে বিষ্ণুর শরণ নিলেন। তাঁরা যখন বিষ্ণুর ধ্যান করছেন, তখন দৈব বাণী হল যে ভয় নেই। ব্রহ্মার বরে হিরণ্যকশিপু দুর্বৃত্ত হয়েছে, তাঁর ভক্তিমান পুত্র প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার করলেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই দৈববাণী শুনে দেবতারা নিশ্চিন্ত হলেন বটে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে দিনপাত করতে লাগলেন।



হিরণ্যকশিপুর চারটি পুত্র, সর্ব কনিষ্ঠের নাম প্রহ্লাদ। তাদের শিক্ষার ভার ছিল শণ্ড ও অমর্কের উপর। এঁরা দুজন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পুত্র। নীতিবিশারদ ও অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন তাঁরা। কিন্তু প্রহ্লাদকে নিয়ে তাঁদের বিপদ

উপস্থিত হয়েছিল। এই বালকটি জন্মাবধি বিষ্ণুভক্ত, সারা দিন বিষ্ণুর চিন্তা করতেন এবং গুরুর অবর্তমানে অন্যান্য বালকদেরও হরিভক্তি শেখাতে লাগলেন। শণ্ডামর্কের দণ্ডনীতি তাঁরা শিখলেন না।

গুরুজী বললেন ঃ বিষ্ণু পুরাণে হিরণ্যকশিপু-প্রহ্লাদ প্রসঙ্গ সবিস্তারে আছে। হিরণ্যকশিপু তাঁর অভ্রময় স্ফটিকের প্রাসাদে যখন সুরাপান করতেন, তখন অপ্সরাগণ তাঁর সামনে নৃত্য করত। সিদ্ধগণের মধ্যে কেউ গান করত, কেউ বাদ্য বাজাত, কেউ বা জয় শব্দ উচ্চারণ করত। গন্ধর্ব ও পন্নগগণ তাঁর উপাসনা করত।

হিরণ্যকশিপু এক দিন সুরাপানে আসক্ত আছেন, এমন সময়ে গুরুর সঙ্গে প্রহ্লাদ তাঁর নিকটে এলেন। প্রহ্লাদ ভূমিষ্ঠ হয়ে পাদবন্দনা করলে হিরণ্যকশিপু তাঁকে তুলে ধরে প্রশ্ন করলেন, বৎস, এত দিন তুমি নিয়ত পাঠ করে যা শিখেছ, আমাকে তাই বল।

প্রহ্লাদ বললেন, যাঁর আদি মধ্য ও অন্ত নির্ণয় করা যায় না, যাঁর জন্ম বৃদ্ধি নেই, ক্ষয় বিনাশ নেই, নিখিল কারণকলাপের যিনি কারণ, সেই মহাত্মাকে নমস্কার।—

অনাদিমধ্যান্তমজমবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্বকারণকারণম্॥

প্রহ্লাদের মুখে এই কথা শুনে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অধীর হলেন। তাঁর নয়ন রক্তবর্ণ হল, অধর পল্লব হল প্রকম্পিত। তিনি প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, আমার শিশু সন্তানকে আপনি আমার শত্রুর স্তব করতে শিখিয়েছেন!

গুরু বললেন, না দৈত্যরাজ, আপনি রাগ করবেন না। প্রহ্লাদকে আমি এ রকম উপদেশ দিই নি।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বললেন, তবে তুমি এ উপদেশ কার কাছে পেলে?

প্রহ্লাদ বললেন, অখিল জগৎকে যিনি জ্ঞান দান করেন, সেই বিষ্ণু আমার হৃদয়ে আছেন।

হিরণ্যকশিপু পুত্রকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তিনিই জগতের ঈশ্বর এবং তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। কিন্তু প্রহ্লাদের এক কথা, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ও অধিষ্ঠাতা হলেন বিষ্ণু। কিছু বাদানুবাদ হবার পর হিরণ্যকশিপু বললেন, কোন পাপাশয় এই বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। একে পুনর্বার গুরুগৃহে পাঠিয়ে ভাল করে শাসন করা দরকার।

দৈত্যরাজের আদেশ পেয়ে দৈত্যরা প্রহ্লাদকে আবার গুরুগৃহে নিয়ে গেল।

প্রহ্লাদ আবার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন।

কিছু কাল পরে পিতাপুত্রে আবার সাক্ষাৎ হল। পিতা পুত্রকে ডেকে বললেন, একটি গাথা পাঠ কর।

প্রহ্লাদ বললেন, প্রকৃতি পুরুষ ও এই চরাচর যাঁর থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যিনি অখিল বিশ্বের কারণ, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, এ আমার কুলাঙ্গার পুত্র। এর জীবিত থেকে কোন লাভ নেই। বধ কর এই দুরাত্মাকে।

দৈত্যরাজের আদেশ পেয়ে শত সহস্র দৈত্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রহ্লাদকে বধ করবার জন্য উদ্যত হল। প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন। তারপর কোন আঘাতে তাঁর বেদনা বোধ হল না, দেহ অক্ষত রয়ে গেল।

হিরণ্যকশিপু তখন সর্পদের আদেশ করলেন প্রহ্লাদকে বিনাশ করতে। তক্ষক অন্ধক ও কুহক প্রভৃতি সর্পেরা প্রহ্লাদের সর্বাঙ্গে দংশন করল। বিষ্ণুর কৃপায় তাঁর শরীরে কোন বিষের ক্রিয়া হল না। সর্পদেরই দাঁত ভেঙ্গে গেল, মাথার মণি পড়ল খসে।

হিরণ্যকশিপু এইবারে দিগ্‌গজদের আদেশ করলেন প্রহ্লাদকে আক্রমণ করতে। দিগ্‌গজেরা মিলিত ভাবে বালককে ভূমিতে নিক্ষেপ করে দন্তাঘাত করল। কিন্তু প্রহ্লাদের দেহে লেগে গজদন্ত ভেঙ্গে গেল, তাঁর কোন ক্ষতি হল না।

হিরণ্যকশিপু চীৎকার করে উঠলেন, আগুন জ্বালো। আর পবন, অগ্নিকে তুমি প্রদীপ্ত কর। এই পাপাত্মা বালককে দগ্ধ করে মারতে হবে।

অসুরেরা কাঠ এনে আগুন জ্বালাল। তারপর প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করল সেই আগুনে। প্রহ্লাদের মনে হল যেন তাঁর দেহের চারি দিকে পদ্মপাতার আস্তরণ বিস্তৃত আছে। বললেন, পিতা, চারি দিক শীতল বলে আমার মনে হচ্ছে।

প্রহ্লাদের গুরু শণ্ডামর্ক এতক্ষণ নীরবে ছিলেন। এইবারে দৈত্যরাজকে স্তব করে বললেন, মহারাজ, আপনি ক্রোধ পরিহার করুন। আমরা এই বালককে সুশিক্ষিত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। যদি একে শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ করাতে না পারি তাহলে একে বিনাশের জন্য আমরাই অভিচার ক্রিয়া করব।

হিরণ্যকশিপু এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। প্রহ্লাদ আবার গেলেন গুরুগৃহে। কিন্তু তাঁর কোন পরিবর্তন হল না। বরং অন্য বালকদেরও তিনি বিষ্ণুভক্তি শেখাতে লাগলেন। দৈত্যরা ভয় পেয়ে হিরণ্যকশিপুর নিকটে গিয়ে সব কথা নিবেদন করল। হিরণ্যকশিপু পাচকদের ডেকে আদেশ করলেন, তোমরা গোপনে তার

খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা কর।

প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে নিবেদন করে সেই বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজন করলেন। অতি সহজে সেই বিষ জীর্ণ হয়ে গেল।

এই সংবাদ পেয়ে হিরণ্যকশিপু পুরোহিতদের ডেকে পাঠালেন। বললেন, প্রহ্লাদকে সংহার করবার জন্য আর কালবিলম্ব না করে আপনারা অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুন।

অভিচার ক্রিয়া করবার আগে গুরুরা প্রহ্লাদের নিকটে গিয়ে বললেন, আয়ুষ্মান, ব্রহ্মার বংশে তোমার জন্ম, তুমি ত্রিলোকের আশ্রয় দৈত্যরাজের পুত্র, একদিন তুমিও সকলের আশ্রয় হবে। তবে কেন তুমি তোমাদের শত্রু বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করছ?

প্রহ্লাদ বললেন, আপনারা ঠিকই বলেছেন। কর্ম দ্বারা আমার পিতা যে জগতে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি কেন অনন্তের আশ্রয় গ্রহণ করছি অনুমতি করলে তা বুঝিয়ে বলতে পারি।

এই বলে প্রহ্লাদ তাঁর গুরুদের সেই কথা বোঝালেন। গুরুরা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি মূর্খ, অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিলে দেখে আমরা তোমাকে রক্ষা করেছি। এখন যদি আমাদের কথা না শোন, তাহলে তোমার সংহারের জন্য আমরা অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করব।

প্রহ্লাদ বললেন, কেউ কাউকে বধ করতে পারে না, রক্ষা করতেও পারে না। আত্মাই আপন সাধু বা অসাধু ব্যবহারে হত বা রক্ষিত হয়ে থাকে।

কঃ কেন হন্যতে জন্তু-র্জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে।
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসন্ সাধু সমাচরণ্॥

প্রহ্লাদের এই কথা শুনে গুরু ও পুরোহিতেরা ক্রোধে অধীর হলেন এবং তৎক্ষণাৎ অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করলেন। তাতে মূর্তিমতী অভিচার ক্রিয়া উৎপন্ন হল। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় তার উজ্জ্বল আকৃতি দেখা গেল, তার পাদবিক্ষেপে ধরণী হল বিচলিত। সেই ভীষণ অভিচার ক্রিয়া একটি প্রদীপ্ত শূল দিয়ে প্রহ্লাদের বক্ষে আঘাত করল। কিন্তু সেই আঘাতে শূল শতধা চূর্ণ হয়ে ভূতলে পড়ল। তারপর সেই অভিচার ক্রিয়া পুরোহিতগণকেই বিনষ্ট করে অন্তর্হিত হল।

প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে স্মরণ করে পুরোহিতদের জীবন প্রার্থনা করলেন, বললেন, এ পর্যন্ত যাঁরা আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের সকলকেই আমি সমদৃষ্টিতে দেখেছি। আমি যদি কারও অনিষ্ট চিন্তা না করে থাকি তাহলে এই পুরোহিতরাও তাঁদের জীবন লাভ করুন।

প্রহ্লাদ এই কথা বলে তাঁদের দেহ স্পর্শ করতেই তাঁরা নিরাময় হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, বৎস তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমি দীর্ঘায়ু হও।

তারপর তাঁরা হিরণ্যকশিপুর নিকটে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমার এই প্রভাব দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। একি তোমার স্বাভাবিক ক্ষমতা, না কোন মন্ত্রের প্রভাব ?

প্রহ্লাদ তাঁকে প্রণাম করে বললেন, বিষ্ণু যাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন, তাদের সকলেরই এই রকম প্রভাব হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে প্রহ্লাদ আরও অনেক কথা বললেন পিতাকে। সমস্ত শুনে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অন্ধ হলেন। তিনি নিজে তখন উচ্চতম প্রাসাদ শিখরে উপবেশন করে ছিলেন। প্রহ্লাদের মুখে এই সব তত্ত্ব কথা শুনেই তিনি কিঙ্করদের আদেশ করলেন, তোমরা এই শত যোজন উচ্চ প্রাসাদ থেকে এই দুরাত্মাকে এমন করে নিক্ষেপ কর যে পাহাড়ের শিলায় যেন এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হয়ে যায়।

কিঙ্করেরা তাই করল। প্রাসাদ চূড়া থেকে নিচে পড়বার সময় প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন। আর জগদ্ধাত্রী পৃথিবী তাঁকে ধারণ করলেন।

প্রহ্লাদের কোন ক্ষতি হল না দেখে হিরণ্যকশিপু শম্বরকে ডেকে বললেন, আমরা তো এই বালককে বিনাশ করতে পারলাম না। তুমি নানা রকম মায়া জান, তুমি মায়াজাল বিস্তার করে একে বধ কর।

শম্বর বলল, আমি শত সহস্র কোটি প্রকার মায়া জানি। আমার কাছে তার পরিত্রাণ নেই।

বলে শম্বর দানব মায়া বিস্তার করতে আরম্ভ করল। প্রহ্লাদ সমাহিত চিত্তে বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন। বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র পাঠালেন প্রহ্লাদকে রক্ষার জন্য। শম্বরের সহস্র মায়া সুদর্শন চক্রে বিনষ্ট হল।

তারপর হিরণ্যকশিপু সংশোধক বায়ুকে বললেন প্রহ্লাদকে ক্ষয় করতে। বায়ু যখন প্রহ্লাদকে শোষণের জন্য তাঁর দেহে প্রবেশ করল, তখন বিষ্ণু স্বয়ং এসে সেই বায়ুকে পান করে ফেললেন।

প্রহ্লাদের মৃত্যু হল না। আবার তাঁকে গুরুগৃহে পাঠানো হল। গুরুরা প্রতি দিন তাঁকে শুক্রাচার্যের নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে লাগলেন। যখন তাঁরা বুঝলেন যে প্রহ্লাদ বিনীত ও নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত হয়েছে তখন তাঁরা হিরণ্যকশিপুকে এই সংবাদ দিলেন।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ডেকে বললেন, নীতিশাস্ত্র পড়ে তুমি কী শিখলে তাই বল।

প্রহ্লাদ সবিনয়ে পিতাকে প্রণাম করে বললেন, নীতিশাস্ত্রের সবটুকুই আমি শিখেছি, কিন্তু এই শাস্ত্রের সঙ্গে আমি এক মত নই। বিষ্ণু যখন সর্বভূতে বিদ্যমান, তখন শত্রু মিত্রে তো কোন প্রভেদ নেই!

তারপর নিজের মত পিতাকে সবিস্তারে বোঝালেন।

হিরণ্যকশিপু আর সহ্য করতে পারলেন না। সিংহাসন থেকে নেমে এসে প্রহ্লাদের বুকে পদাঘাত করলেন। তারপরে বিপ্রচিত্তি ও রাহুকে ডেকে বললেন, তোমরা এই বালককে নাগপাশে বন্ধন করে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর।

অবিলম্বে দৈত্যরা প্রভুর আদেশ পালন করল। প্রহ্লাদের চারি দিকে মহাসাগর ক্ষুভিত ও উদ্বেল হয়ে উঠল। তাই দেখে হিরণ্যকশিপু বললেন, এইবারে দুর্মতিকে পর্বতে আচ্ছাদন কর।

দৈত্যরা অমনি সমুদ্রে পর্বত এনে সহস্র যোজন পর্যন্ত আচ্ছাদন করে দিল। কিন্তু প্রহ্লাদ এই আচ্ছাদনের নিচেই বিষ্ণুর ধ্যান করতে লাগলেন। ক্রমে তিনি তন্ময় হয়ে নিজেকেই অচ্যুত বিষ্ণু বলে বোধ করতে লাগলেন। এক সময় তাঁর বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। বুকের শৈল দূরে নিক্ষেপ করে প্রহ্লাদ সমুদ্র থেকে নির্গত হলেন।

এইবারে পীতাম্বরধারী বিষ্ণু তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, বৎস, তুমি বর নাও।

প্রহ্লাদ বললেন, আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করে আমার পিতার যে পাপ হয়েছে, আপনার প্রসাদে তিনি সেই পাপমুক্ত হোন।

বিষ্ণু বললেন, তথাস্তু। তুমি আরও কোন বর নাও।

প্রহ্লাদ বললেন, তবে এই বর দিন যে আপনাতে আমার ভক্তি যেন দৃঢ়তর হয়।

তথাস্তু।

বলে বিষ্ণু অন্তর্হিত হলেন।

এবারে প্রহ্লাদ যখন পিতার নিকটে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন, হিরণ্যকশিপু তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং বাষ্পাকুল লোচনে বললেন, বৎস, আমি তোমাকে অনেক পীড়া দিয়েছি, কিন্তু তোমাকে জীবিত দেখে আজ আমার আনন্দ হচ্ছে।

হিরণ্যকশিপু অনুতাপ করেছিলেন তাঁর নিষ্ঠুর আচরণের জন্য। আর প্রহ্লাদ সযত্নে শুশ্রূষা করেছিলেন গুরু ও পিতার।

গুরুজী বললেন: আমি এই কাহিনী বললাম বিষ্ণুপুরাণ থেকে। এর পরের শ্লোকেই হিরণ্যকশিপু নিহত হয়েছেন নরসিংহের হাতে। কিন্তু আমাদের মন এই

ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়নি। আগের শ্লোকটি পড়ে আমাদের মনে হয়েছিল যে পিতাপুত্রে মিলন হয়ে গেল। বিষ্ণুর কাছে পুত্র ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন পিতার নিষ্ঠুর কর্মের জন্য, আর পিতা অনুতপ্ত হয়ে পুত্রকে আলিঙ্গন করেছেন বাষ্পাকুল নয়নে। এর পরে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না।

আমার মনে হয় যে এই ছোট ঘটনাটিতেই হিরণ্যকশিপুর চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। কঠিন হৃদয় দৈত্যরাজ পুত্রকে বিনাশ করবার আদেশ দিয়ে তাঁর রাজধর্ম পালন করেছেন। পুত্র তাঁর শত্রুকে স্তব করবে, আর অন্যান্য বালককে শেখাবে সেই স্তব, রাজার নিকট এই ধৃষ্টতা অসহ্য। তাঁকে শাসন করেছেন, গুরুগৃহে পাঠিয়েছেন বিশেষ নির্দেশ দিয়ে। মতের পরিবর্তন হয় নি দেখে আবার শাসন করেছেন। মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রাজধর্ম পালন করেছেন ভারাক্রান্ত মনে। কিন্তু তাঁর হৃদয়েও ছিল সাধারণ মানুষের মতো সন্তান-স্নেহ। একান্তে তিনি সন্তানের পিতা, দুর্বল স্নেহান্ধ। কঠিন পরীক্ষার পর পুত্র যখন ফিরে এসে তাঁকে প্রণাম করল, তিনি তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। দুচোখ তাঁর জলে ভরে গেল। কোন রকমে বললেন, তুমি বেঁচে আছ! আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।

এই মুহূর্তে হিরণ্যকশিপু ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি দৈত্যরাজ। পুত্রকে আলিঙ্গন করে তিনি পিতার ধর্ম পালন করলেন। এই সামান্য ঘটনাটি না লিখলে হিরণ্যকশিপুর চরিত্র বোধহয় মিথ্যা হয়ে যেত।

গুরুজী বললেন : এর পরের ঘটনায় পুরাণ হরিবংশ ও ভাগবতে কিছু মতান্তর আছে। ভাগবতের কাহিনীই সমধিক প্রচলিত। সে কাহিনী আমরা শৈশবে পড়েছি।

অন্যত্র দেখি যে দেবতাদের অনুরোধেই বিষ্ণু অর্ধ-নৃসিংহ মূর্তিতে হিরণ্যকশিপুর সভায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই অদ্ভুত প্রাণী দেখে হিরণ্যকশিপু তাঁকে বন্ধন করতে বলেছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ চিনতে পেরে বলেছিলেন, পিতা, আর আপনার রক্ষা নেই।

অসুরেরা এই নরসিংহকে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করেছিল। বহু শত বর্ষ যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধেই হিরণ্যকশিপু নিহত হন।

আমাদের শৈশবে পড়া গল্প আমার মনে পড়ল। একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে সরোষে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় তোর হরি?

প্রহ্লাদ বললেন, হরি সর্বত্র আছেন।

তাই যদি হয়, তবে এই স্তম্ভে নেই কেন?

প্রহ্লাদ সেই স্তম্ভ নিরীক্ষণ করে প্রণাম করে বললেন, ঐ তো তাঁকে আমি

দেখতে পাচ্ছি।

হিরণ্যকশিপু বলে উঠলেন, আজ আমি তোর মুণ্ডপাত করব, দেখি তোর হরি তোকে রক্ষা করে কিনা।

বলে খড়্গ হাতে সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। তারপর সেই স্তম্ভে প্রবল শক্তিতে মুষ্ট্যাঘাত করলেন। স্তম্ভ ভেঙে পড়ল, আর তার ভিতর থেকে ভয়ঙ্কর নিনাদ করে বেরিয়ে এলেন নরসিংহ দেব। ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণী নয়, দেবতাও নয়। অভূতপূর্ব মূর্তি, নরদেহে সিংহের মুখ, ভ্রূকুটি-কুটিল বিজৃম্ভিত জটা। তাঁর দুই চক্ষু তপ্ত কাঞ্চনের মতো পিঙ্গল, করাল দন্ত করবালের মতো, জিহ্বা ক্ষুরধার। বিকট হুঙ্কারে পৃথিবী কাঁপিয়ে তিনি হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করলেন।

তখন দিবস নয়, রাত্রিও নয়। সায়াহ্নের অন্ধকারে সংগ্রাম শুরু হল। নৃসিংহ দেব অসুরকে নিজের উরুর উপরে ফেলে নখ দিয়ে তাঁর কুক্ষি বিদীর্ণ করলেন। হিরণ্যকশিপু বধ হল। ইন্দ্র তাঁর স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন, দেবতারা পেলেন আপন আপন অধিকার।

গুরুজী বললেন : হিরণ্যকশিপু বধের কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতে আছে সবিস্তারে।

হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পরে প্রহ্লাদ রাজা হলেন।

প্রহ্লাদ কেন, প্রহ্লাদ তো হিরণ্যকশিপুর জ্যেষ্ঠপুত্র নয়! হ্রাদ, সংহ্রাদ, অনুহ্রাদ এঁরা কি বেঁচে ছিলেন না, না নৃসিংহ অবতার নিজে তাঁর ভক্তকে সিংহাসনে বসিয়ে গেলেন!

গুরুজী বললেন : আমার মনে হয় যুদ্ধে তারা নিহত হয়েছিল।

তার পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। অসুরদের কোন রাজ্যের কথা তো শোনা যায় নি! দেবতাদের ছিল স্বর্গরাজ্য। অসুরেরা মাঝে মাঝে বাহুবলে সেই স্বর্গ রাজ্য অধিকার করেছে। ইন্দ্রকে পরাজিত করে রাজা হয়েছে স্বর্গের। তারপর স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতারা গেছেন বিষ্ণুর কাছে, ছলে বলে কৌশলে বিষ্ণু তাঁদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করে দিয়েছেন। কাজেই হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পরে ইন্দ্র যখন তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন, তখন প্রহ্লাদ রাজা হলেন কোন রাজ্যের!

পুরাণে বুঝি এ প্রশ্নের উত্তর নেই। গুরুজী আমাদের এ প্রসঙ্গে কিছু বললেন না। তবে প্রহ্লাদের পৌত্র বলির প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে বলি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন ভৃগুকচ্ছে। নর্মদার উত্তর তীরে ভৃগুকচ্ছ পুরাকালে একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। এখন এটি গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত একটি শহর, নাম ব্রোচ।

গুরুজী বললেন : প্রহ্লাদের রাজত্বকালে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাওয়া যায় না। দেবতাদের সঙ্গে তিনি নিশ্চয়ই বিবাদ করেন নি। নিজের রাজ্যে সুখে

কাল যাপন করেছেন এবং দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন বলে অনুমান করা যায়। তার কারণ প্রহ্লাদ তাঁর পৌত্র বলির হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে বানপ্রস্থে গিয়েছিলেন। বলির পিতা বিরোচন তখন নিশ্চয়ই জীবিত ছিলেন না। কোন যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর মৃত্যু হয়েছে অনুমান করবার উপায় নেই, কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে তার উল্লেখ পুরাণে থাকত। কাজেই হিসাব মিলাবার জন্যে ধরে নিতে হয় যে বিরোচনের মৃত্যুর পরেই প্রহ্লাদ বলির হাতে রাজ্যভার দিয়ে বানপ্রস্থে গিয়েছিলেন।

প্রহ্লাদের জীবনের দ্বিতীয় ঘটনা আমরা এই সময়ে পাই। তিনি যখন বদরিকাশ্রমে, তখন নরনারায়ণের সাক্ষাৎ পেয়ে ভণ্ড তপস্বী ভেবেছিলেন। তারপর তাঁদের ঘোর যুদ্ধ হয়। বহু শত বর্ষেও তাঁদের জয় পরাজয় হল না দেখে প্রহ্লাদ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে নৈমিষ্যারণ্যে চলে আসেন। সেখানে তিনি বিষ্ণুর তপস্যা করে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এর পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বদরিকাশ্রমে তিনি যাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তিনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাই আবার সেখানে ফিরে গিয়ে তিনি নরনারায়ণের পূজা করেন।

বলি এই সময়ে তাঁর বাহুবলে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেছিলেন। প্রহ্লাদ যখন পৌত্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্য স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন, বলি তখন তাঁকে স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করলেন। প্রহ্লাদের ভোগের বাসনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। বললেন, আমার আর রাজত্বের প্রয়োজন নেই। বাকি জীবন আমি বিষ্ণুর ধ্যান করেই কাটিয়ে দেব।

প্রহ্লাদ ফিরে গেলেন। কিন্তু বলি শান্তিতে রাজত্ব করতে পারলেন না। রাজ্যচ্যুত ইন্দ্র ও দেবতারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিলেন। ব্রহ্মপুরাণ থেকে আমরা সেই কথা জানতে পারি।

ব্রহ্মা নারদকে বলির কথা বলছেন, অপরাজেয় দেবশত্রু বলি, ধর্ম যশ প্রজাপালন গুরুভক্তি সত্য বলবীর্য ত্যাগ ও ক্ষমা গুণে ত্রিভুবনে তাঁর কোন উপমা ছিল না। তাঁর রাজ্যশাসনের গুণে ত্রৈলোক্য নিষ্কণ্টক হয়ে গেছে। আধিব্যাধি শত্রুভয় অনাবৃষ্টি অধর্ম দুর্জনের উপদ্রব অভাবজনিত আর্তনাদ স্বপ্নেও আর কেহ অনুভব করে না। বলির এই সমুন্নত সমৃদ্ধি দেখে দেবতারা চিন্তিত হলেন। তাঁর খ্যাতির শরে ভগ্ন চিত্ত, কীর্তির খড়্গে দ্বিধাকৃত ও আজ্ঞার প্রভাবে ভিন্নগাত্র হয়ে সর্বত্র তাঁদের শান্তি অবলুপ্ত হল। বলির যশে তাঁরা ঈর্ষান্বিত হলেন, মাৎসর্য বশে বিহ্বল হয়ে পরস্পর মন্ত্রণা করে তাঁরা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বললেন,

মনসা কর্মণা বাচা ত্বামেব শরণং গতাঃ।
ত্বদঙ্ঘ্রি শরণং সন্তঃ কথং দৈত্যং নমেমহি॥

কায়মনোবাক্যে আমরা আপনারই শরণ নিয়েছি। এখন আপনার চরণাশ্রিত হয়ে আমরা দৈত্যকে কেমন করে নমস্কার করব!

গুরুজী বললেন : ব্রহ্মপুরাণের এই শ্লোকগুলি সত্যিই অপূর্ব। শুধু বিষ্ণুর স্তব নয়, প্রত্যেকটি চরণের শেষে কথং দৈত্যং নমেমহি। দৈত্যকে আমরা কেমন করে নমস্কার করব! এই শ্লোকগুলি পড়তে পড়তে চণ্ডীর কথা মনে পড়বে, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

নারদকে ব্রহ্মা বললেন না যে দেবতাদের স্তবে বিষ্ণু ভুলে গেলেন এবং বলির কোন অপরাধের কথা জানতে চাইলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বলিকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে দেবতাদের মনে সুখ শান্তি আর ফিরে আসবে না। বললেন, বলি আমার ভক্ত বলেই সুরাসুরের অবধ্য। তাকে বিনা যুদ্ধে মন্ত্রণায় বন্ধন করে তোমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেব।

গুরুজী বললেন : ভাগবতেও বলিকে নির্দোষ বলে স্বীকার করা হয়েছে। রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বামন অবতারে বিষ্ণু প্রার্থিত ত্রিপাদ ভূমি লাভ করেও নির্দোষ বলিকে কেন বন্ধন করেছিলেন?

বলির কোন অপরাধের কথা কোন পুরাণে লিখিত হয় নি। তিনি তাঁর বাহু-বলে ইন্দ্রকে জয় করে ত্রিভুবনের অধিপতি হয়ে বসেছিলেন। দেবতারা সবাই অনাথের মতো চারি দিকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাই দেখে দেবমাতা অদিতি কশ্যপের নিকটে দুঃখ করে বললেন, সপত্নী পুত্র অসুরেরা রাজ্য অপহরণ করে আমাদের নির্বাসিত করেছে। আপনি এর একটা বিহিত করুন।

অসুরেরাও কশ্যপের পুত্র। স্ত্রীর প্রস্তাব শুনে কশ্যপ বললেন, তুমি বিষ্ণুর উপাসনা কর, তিনি তোমার মঙ্গল করবেন। ফাল্গুন মাসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পয়োব্রতের অনুষ্ঠান করলে বিষ্ণু তোমার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করে এই দুঃখ দূর করবেন।

সত্যি সত্যিই বিষ্ণু অদিতির কোলে এলেন বামন রূপে। তাঁর উপনয়ন হল এবং ভিক্ষাপাত্র হাতে তিনি ভিক্ষার জন্য বহির্গত হলেন। অসুর রাজ বলি তখন অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করছেন নর্মদার উত্তর তীরে ভৃগু-কচ্ছে। বেদবেদাঙ্গবেদী শুক্রাচার্য পুরোহিত। চারি দিকে দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ রব। এমন সময়ে চিত্রকুণ্ডলেমণ্ডিত বামন দেব সামগান করতে করতে যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। খর্ব দেহ, মুক্তা মেখলায় শোভিত কটি, কৃষ্ণাজিনময় উত্তরীয় যজ্ঞোপবীতের ন্যায় বামস্কন্ধে লম্বিত, মাথায় জটাকলাপ, জ্যোতির্ময় পুরুষ।

গুরু শুক্রাচার্য অরিন্দম বলিকে গিয়ে বললেন, ছদ্মবেশে বিষ্ণু এসেছেন দেবতা-

দের হিতার্থে, আমার সঙ্গে মন্ত্রণা করে এঁকে দান কোরো।

দানশীল বলি বললেন, যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং আমার গৃহে এসেছেন, এতেই আমি ধন্য।

বলে গুরুর সঙ্গে সস্ত্রীক বাহিরে এলেন। সসম্মানে বামনকে অভ্যর্থনা করে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে বললেন, পথ শ্রমে আপনার কষ্ট হয় নি তো! আপনার পদার্পণে আমাদের কুল পবিত্র হল। এইবারে আপনার অভিলষিত বস্তু গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।

বামন বললেন, তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ। তোমার কুলে ব্রাহ্মণকে দান করব বলে কেউ কখনও প্রত্যাখ্যান করে নি। তোমার কাছে আমার সামান্যই প্রার্থনা—আমার নিজের ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমি তুমি আমাকে দাও।

বামনের কথা শুনে বলি হাসলেন। বললেন, আপনি বালক, তাই আপনার বুদ্ধি এখনও হয় নি। ত্রিলোকের অধিপতির কাছে আপনি ত্রিপাদ ভূমি যাজ্ঞা করছেন! আমি আপনাকে একটি দ্বীপ দান করতে পারি। আমার কাছে দান গ্রহণের পর আর কারও কাছে যাতে আপনাকে ভিক্ষা করতে না হয়, আপনি তেমন কিছু আমার কাছে চান।

বামন বললেন, বাসনার শেষ নেই। জিতেন্দ্রিয় না হলে ত্রিলোক লাভেও সুখ নেই। তাই যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিগ্রহ করেন না।

বলি হেসে বললেন, তথাস্তু। আমি আপনাকে পদত্রয় পরিমিত ভূমিই দেব।

এইবারে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বলিকে বাধা দিলেন, বললেন, সাবধান, এই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ তোমার সর্বস্ব অপহরণ করতে এসেছেন। এঁকে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি ভাল কর নি। এখনও সতর্ক হবার সময় আছে।

নির্ভয়ে বলি বললেন, হোক ছলনা, আমাকে আমার সত্যপালনে আজ্ঞা করুন প্রভু।

গভীর ক্ষোভে শুক্রাচার্য বললেন, তুমি তোমার সত্যপালনে সমর্থ হবে না। এই মায়া রূপ পরিবর্তিত হলে তুমি ত্রিপাদ ভূমি তাঁকে দিতে না পেরে নরকবাসী হবে। এখনও তোমার ফেরার পথ আছে, তুমি নিরস্ত হও।

বলি বললেন, আপনার কথা সত্য। কিন্তু আপনার আদেশ শুনলে আমার সত্য ভঙ্গ হবে। বিষ্ণু আমাকে বঞ্চনা করতে পারেন, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করতে পারব না। যদি সত্য রক্ষা করতে পারি, তাহলে নরকে আমার ভয় নেই, মৃত্যুকেও আমি ভয় পাই নে।

শুক্রাচার্য এবারে ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন, তুমি অজ্ঞ হয়েও তোমার পণ্ডিতের

মতো অভিমান। আমার উপদেশ লঙ্ঘনের জন্য তুমি অচিরে শ্রীভ্রষ্ট হবে।

শুক্রর অভিশাপেও বলি বিচলিত হলেন না। বললেন, প্রভু, আপনার অভিশাপ আমি মাথা পেতে নিলাম।

তারপর তিনি বামনকে ভূমি দানের জন্য উদ্যত হলেন।

শিষ্যের কল্যাণের জন্য গুরু শুক্রাচার্য শান্ত থাকতে পারলেন না। মক্ষিকা রূপে ভৃঙ্গারে প্রবেশ করে জল রোধ করলেন। শুক্রাচার্যের অভিসন্ধি বামন বুঝতে পেরেছিলেন, তাই ভৃঙ্গারের মুখে কুশ চালিয়ে দিলেন। মক্ষিকা রূপী শুক্রাচার্যের একটি চোখ কুশবিদ্ধ হয়ে নষ্ট হয়ে গেল।

তারপর?

তারপর বলি যখন জল স্পর্শ করে বামনকে ভূমি দান করলেন, তখন বামনের রূপ পরিবর্তিত হতে লাগল। তাঁর দেহ এমন বিরাট হল যে বিস্ময়ে সকলে হতবাক হয়ে গেল। কিন্তু বলি বিচলিত হলেন না, বললেন, আপনি শক্তি অনুসারে যত দূর ইচ্ছা আপনার পদ দ্বারা আক্রমণ করুন।

বামন পদন্যাস করলেন। তাঁর এক পায়ে পৃথিবীর সমস্ত ভূমি আক্রান্ত হল, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ হল অধিকৃত, তৃতীয় পদ রাখবার আর জায়গা রইল না। তখন বলিকে বললেন, বল এইবারে আমার তৃতীয় পদের স্থান কোনখানে! কোথায় আমি এই তৃতীয় পা রাখব?

বলি কৃতাঞ্জলি পুটে সহাস্যে উত্তর দিলেন, প্রভু আমি তো এই জগতের স্রষ্টা নই, এ জগৎ আপনিই সৃষ্টি করেছেন। আপনারই সৃষ্টির দোষে এই পৃথিবী এমন ক্ষুদ্র হয়েছে। এতে আমার কী করবার আছে!

ত্বয়া সৃষ্টং জগৎ সর্বং ন স্রষ্টাহং সুরেশ্বর।
ত্বদ্দোষাদল্পমভবৎ কিং করোমি জগন্ময়॥

বলি নির্বিকার চিত্তে বললেন, প্রভু, আমি মিথ্যা বলি না। আপনি আমার সঙ্গে কপটতা করে থাকতে পারেন, কিন্তু আমার অঙ্গীকার আমি পূর্ণ করব। আপনার তৃতীয় পদ আপনি আমার মাথায় রাখুন।

বলে তাঁর মাথা নত করলেন। বামন তাঁর তৃতীয় পদ বলির মাথায় রাখলেন, আর বন্ধন করলেন তাঁকে।

বলির মহিষী বিন্ধ্যাবলি পতির পাশবদ্ধ দশা দেখে কাতর হয়ে বামনকে বললেন, প্রভু, আমার স্বামী স্বীয় কর্মে যা কিছু অর্জন করেছিলেন, সবই তো আপনাকে দান করেছেন। তারপরেও তাঁকে কেন বন্ধন করছেন?

এই অভিযোগের উত্তরে বামন বললেন, যাকে আমি দয়া করি, তার সর্বস্ব হরণ

করি প্রথমেই। বিত্ত ও প্রতিপত্তির লোভই তো মানুষকে মোহগ্রস্ত করে; কিন্তু বলি এই মোহকে জয় করেছিল। তার বিপদের কথা জেনেও সে সত্যকে পরিহার করে নি, গুরুর অভিশাপ গ্রহণ করেছে মাথা পেতে। আমি প্রীত হয়েছি, আমি তাকে বর দেব।

তারপর বলির দিকে তাকিয়ে বললেন, দৈত্যরাজ, তুমি আমার কাছে বর নাও।

বলি বললেন, কিন্তু প্রভু, আমার তো কোন প্রার্থনা নেই!

বামন বললেন, তা নেই জানি। তবু আমি তোমাকে বর দিচ্ছি। সাবর্ণি মন্বন্তরে তুমি ইন্দ্র হবে, আর এখন রসাতলের আধিপত্য নিয়ে বিশ্বকর্মা বিনির্মিত ভূতলে বাস কর। আমি তোমাকে অবিনশ্বর যশ অর্পণ করলাম।

গুরুজী বললেন: এই সময়ে আমরা প্রহ্লাদকেও আবার দেখতে পাই। পৌত্রের বিপদ দেখে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। বিষ্ণুর স্তব করেছিলেন তাঁর উদ্ধারের জন্য। কিন্তু বামন পুরাণে আমরা প্রহ্লাদের শাপের কথারও উল্লেখ দেখি। বলি এক দিন প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পিতামহ, আমাদের শক্তি হ্রাস হচ্ছে কেন?

প্রহ্লাদ বলেছিলেন, অদিতির কোলে বিষ্ণু বামন রূপে জন্ম নিয়েছেন। তোমাদের পরাজিত করে তিনি স্বর্গরাজ্য ইন্দ্রকে প্রদান করবেন।

বলি সগর্বে বলেছিলেন, দেবতাদের সাধ্য কি যে যুদ্ধে আমাদের বীরদের পরাজিত করে!

এই অহঙ্কারের কথা শুনেই প্রহ্লাদ বলিকে শাপ দিয়েছিলেন, তুই বিষ্ণুর নিন্দা করলি! ধিক তোকে, এই অহঙ্কারেই তোর পতন হবে। তোর স্বর্গরাজ্য যাবে, আর তুই যাবি পাতালে।

বলি সত্যই পাতালে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যান নি। সত্যাশ্রয়ী বীর বলি সগৌরবে পাতালবাসী হলেন।

ইন্দ্র তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন, কিন্তু তাতে বলির মহিমা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হল না।



সাহসে ভর করে আমি অসুরের কথা লিখতে আরম্ভ করলাম। প্রথমে অনেক দ্বিধা ও অনেক সঙ্কোচ ছিল মনে। আস্তে আস্তে সে সমস্ত দূর হয়ে গেল। একটু-খানি সাহস অনেক সাহস সঞ্চয় করে, দৃঢ় করে মন, ভয় ভীতি দূর হয়ে যায়। আমি আমার জ্ঞানের পরিমাণ জানি। তা নিয়ে গর্ব করবার কিছু নেই, বরং এই অনধিকার চর্চার জন্য লজ্জা পাওয়া উচিত। কিন্তু গুরুজীর আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। সকলের উপরে তিনি সমান নজর রেখেছেন। কাল শকুন্তলাদি আমাকে যে কথা বলেছেন সে গুরুজীর কথা কিনা, সে সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে। গুরুজী হয়তো নিজে কিছু বলবার আগে শকুন্তলাদিকেই বলেছেন আমাকে সেই কথা বলবার জন্য। আমি স্থির করেছি যে দেবতা ও অসুরের চরিত্র সম্বন্ধে আমি কোন ধারণার বশবর্তী থাকব না। একে একে আমি পরিচিত অসুর-দের কথা বলে যাব, যেমন বলেছি দেবতাদের কথা। তারা ভাল কি মন্দ, তা প্রমাণ হবে তাদের কর্ম দিয়ে।

সারা দুপুর লেখবার পর বিকেল বেলায় আমি গঙ্গার ধারে এসে একখানা পাথরের উপরে বসলাম। উন্মুক্ত আকাশের নীচে একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করি। কলস্বনা গঙ্গার স্রোতেও এই আনন্দের প্রতিধ্বনি। ছুটি পেলে তাই আমি গঙ্গার ধারে চলে আসি। প্রকৃতির রূপ দেখি। হিমালয় ও গঙ্গার রূপ। অপরিসীম আনন্দে মন আমার ভরে যায়।

মিসেস খুরানা যে আমাকে অনুসরণ করে গঙ্গার ধারে চলে এসেছিলেন, আমি তা দেখতে পাই নি। কিন্তু তিনি আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। এক সময় তাঁর হাসির শব্দে আমি চমকে উঠলাম।

আমাকে ফিরে তাকাতে দেখে মিসেস খুরানা জিজ্ঞাসা করলেন : ভয় পেলেন নাকি ?

আমি বললাম : ভয় পাব কেন !

তবে চমকে উঠলেন যে !

বলে মিসেস খুরানা আমার পাশে এসে আর একখানা পাথরের উপরে বসলেন। দুজনের দূরত্ব রইল না দেখে আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। বললাম :

এ সময়ে এত কাছে কাউকে আশা করি নি তো !

মিসেস খুরানা সকৌতুকে বললেন : কোন সময়েই কি তা করেন ?

বললাম : না। এখানে আমাদের একটি মাত্র লক্ষ্য। ভাবনাও একটি।

মিসেস খুরানা বললেন : আমারও তাই। তবে সে লক্ষ্য ঐ মাস্টারনীর মতো নয়।

আপনি কি শকুন্তলাদির কথা বলছেন ?

তার তো ঐ রকমই একটা নাম শুনেছি।

আমি বললাম : শকুন্তলাদির মতো আমরাও এখানে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কথা শুনতে এসেছি।

মিসেস খুরানা বললেন : ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে এর চেয়েও ইন্টারেস্টিং গল্প শুনেছি। এ রকম মানুষের মতো রাক্ষস নয়, রিয়াল রাক্ষস। মানুষকে তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে টেনে নেয়, আর—

বাধা দিয়ে আমি বললাম : জানি সে সব গল্প।

জানেন না, জানলে এ সব পানসে গল্প এমন মনোযোগ দিয়ে শুনতেন না। ঠাকুমার গল্পগুলো এমন থ্রিলিং ছিল যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। এক একটা মারাত্মক রাক্ষস যখন কোন রাজ্যে এসে উপস্থিত হত, তখন সব ছারখার হয়ে যেত। এক রাজকন্যা ছাড়া আর সবাইকে সে খেয়ে ফেলত। তারপর ভিন দেশের রাজপুত্র এসে কেমন করে সেই রাক্ষস মারত—

বললাম : ঠাকুমার কাছে আমরাও সে সব গল্প শুনেছি।

শুনেছেন তো ! তবেই বলুন, সে সব গল্পের কাছে এই বলি প্রহ্লাদের গল্প !

মিসেস খুরানার মুখের দিকে আমি কাতর ভাবে তাকালাম। এমন অদ্ভুত কথার কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না।

মিসেস খুরানা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন : আমার কথায় খুব আঘাত পেলেন, তাই না ?

ঠিক এই সময়ে আমাকে রক্ষা করল স্বপ্তি। পিছন থেকে বলে উঠল : বিনায়ক এইখানে, আর আমি সব জায়গায় তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আজ এই মুহূর্তে স্বপ্তিকে আমার ভাল লাগল ! বললাম : আমাকে আবার খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন ?

শকুন্তলাদি যে তোমার খোঁজ করছেন !

মিসেস খুরানা বললেন : আপনার সঙ্গে তাঁর কী দরকার !

চল চল, শিগগির চল।

বলে স্বপ্তি আমাকে ডাকল।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। মিসেস খুরানা আমার হাত ধরে বসিয়ে দিলেন। বললেন : দরকার থাকে, নিজেই এখানে আসবেন।

স্বপ্তি হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল : যাই, তাহলে বলি গিয়ে এই কথা।

বলে তরতর করে গঙ্গার ধার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিসেস খুরানা তার দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন : দেখলেন তো মেয়েটাকে, সারাক্ষণ অন্যের নামে লাগিয়ে বেড়াচ্ছে।

বললাম : লাগাবে আবার কী! ডাকতে এসেছিল, ফিরে গিয়ে বলবে, এল না।

মিসেস খুরানা বললেন : আরও অনেক কথা বলবে। আমি যে আপনাকে যেতে দিলাম না, সে কথাও বলবে।

বললাম : সে তো সত্যি কথা, সে কথা বললে আর দোষ কী!

অকারণে দুর্নাম রটানোকে আপনি প্রশ্রয় দেন!

অকারণে হলে আপত্তি করা উচিত, কিন্তু এ তো অকারণে নয়!

মিসেস খুরানা যেন খুবই রাগ করলেন, এমনি ভাবে বললেন : আপনি তা বলবেন বইকি।

তারপরেই বললেন : থাক সে কথা, একা বসে কী ভাবছিলেন তাই বলুন।

বললাম : সে কথা আপনার ভাল লাগবে না।

লাগবে।

শিবের জটা থেকে গঙ্গার মুক্তির কথা মনে এসেছিল, তারপরে সমুদ্র মন্থনের কথা মনে পড়ত।

প্রবল বিস্ময় নিয়ে মিসেস খুরানা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললাম : কোথায় যেন শুনেছি যে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন হয়েছিল বলি রাজার রাজত্ব কালে। কাল গুরুজীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হয় নি। ভাবছি, কিছু জিজ্ঞাসা করব কিনা।

মিসেস খুরানা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

বললাম : সমুদ্র মন্থনের গল্প আমরা দেবতার কথায় শুনেছি।

দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মী যখন পাতালবাসী হলেন, তখন শ্রীভ্রষ্ট হলেন দেবতারা। অসুরেরা পরাক্রান্ত হয়ে যুদ্ধে দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করল। অনেক দেবতাও নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। পৃথিবী থেকে যাগযজ্ঞ লোপ পেয়ে গেল, শ্রীহীন শক্তিহীন দেবতারা অনেক ভেবে চিন্তে সুমেরু শিখরে ব্রহ্মার

নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ইন্দ্রাদি দেবতা বিপদে পড়ে সাহায্য প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা তাঁদের বিষ্ণুর কাছে নিয়ে যান। বিষ্ণু সাহায্য করেন অবতার রূপে। এবারেও বিষ্ণু বললেন, ভাল কথা। আমি তোমাদের সাহায্য করব, কিন্তু তার আগে তোমরা অসুরদের সঙ্গে সন্ধি কর। তাদের কাছে সাহায্যের প্রয়োজন আছে।

শত্রুর কাছে আবার সাহায্য কিসের!

বিষ্ণু বললেন: এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে অমৃতের দরকার। সমুদ্র মন্থন করে অমৃত পাওয়া যাবে। প্রথমে সমস্ত ওষধি ও লতাপাতা ক্ষীরোদ সাগরে নিক্ষেপ কর। মন্দার পর্বতকে কর মন্থন দণ্ড আর বাসুকিকে রজ্জু। তোমরা এক দিকে ধর, আর এক দিকে ধরুক অসুরেরা। পৃথিবী যাতে এই মন্থনের বেগে রসাতলে না যায়, তার জন্যে কূর্ম রূপে আমি মন্দারকে ধারণ করব।

দেবতারা বললেন, তথাস্তু।

বিষ্ণু বললেন, আর একটা কথা। মন্থনের সময় যে সমস্ত জিনিস উঠবে, তার প্রতি লোভ কোরো না। শুধু অমৃত নয়, কালকূটও উঠবে। তাতেও ভয় পাবার কিছু নেই।

বিষ্ণুর আদেশ শিরোধার্য করে দেবতারা বিদায় নিলেন।

তারপর ইন্দ্র গেলেন দৈত্যরাজ বলির কাছে। সমুদ্র মন্থনের প্রয়োজনীয়তা তাঁকে ভাল করে বোঝালেন। দুজনে সন্ধি হল। দেবাসুর মিলিত হয়ে সমুদ্র মন্থন করবেন।

প্রথমে তাঁরা মন্দার পর্বত আনতে গেলেন। খুব ভারি পর্বত। মাঝ রাস্তায় তা মাটিতে পড়ে গেল। পর্বতে চাপা পড়ে অনেক দেবাসুর মারা গেল। তখন বিষ্ণু এসে তাদের রক্ষা করলেন। আর মন্দারকে গরুড়ের পিঠে তুলে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে এনে নামিয়ে দিলেন। এবারে সমুদ্রের অনুমতির দরকার। অমৃতের ভাগ পাবেন, সমুদ্র এই শর্তে মন্থনের অনুমতি দিলেন।

বাসুকিকে রজ্জুর মতো মন্দারের গায়ে জড়ানো হল। বিষ্ণু বললেন, দেবতারা মুখের দিকে ধর, আর অসুরেরা লেজের দিকে। অসুররা ভাবল যে তাদের প্রতি অবিচার করা হল। বলল, আমাদের জন্মকর্ম অপ্রশস্ত নয়, বেদাধ্যয়ন করেছি, অস্ত্রবিদ্যা শিখেছি, তবে আমরা লেজের দিকে কেন ধরব! সাপের লেজ ধরলে যে অমঙ্গল হয়, সে কথা তো শাস্ত্রেই আছে!

বিষ্ণু হেসে বললেন: তবে তোমরা মুখের দিকেই ধর।

দেবতারা লেজের দিকে ধরলেন। মন্থন শুরু হল। কিন্তু মন্দার পর্বত সমুদ্রের

গর্ভে ডুবে যেতে লাগল। তাকে ধারণ করে এমন কোন আধার নেই। দেবতারা অসুরদের দিকে তাকালেন, আর অসুরেরা দেবতাদের দিকে। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু কূর্মের আকার ধারণ করে মন্দারকে ধারণ করলেন। এবারে নির্বিঘ্নে মন্থন চলল।

প্রথমে উঠল সুরভী গাভী, মহর্ষিরা তার সেবার ভার পেলেন। সুরভীর ঘৃতে যজ্ঞ উদ্ধার হবে। তার পরে শাদা ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবা উঠল। এই নিয়ে ইন্দ্র ও বলির মধ্যে বচসা দেখে বিষ্ণু বলিকেই দিলেন। পরে ইন্দ্র এই উচ্চৈঃশ্রবাকে পেয়েছিলেন। তারপরে উঠল চার দাঁতের ঐরাবত হাতী। ইন্দ্রের ভাগে পড়ল। একে একে অষ্টদিগ্‌গজ অষ্ট করিণী পদ্মরাগ ও কৌস্তভ মণি উঠল। কৌস্তভ মণি বিষ্ণু নিজের বুকে ধারণ করলেন। তারপর উঠলেন লক্ষ্মী দেবী ও উদ্ধত যৌবনা বরুণকন্যা বারুণী, মদিরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বারুণীকে অসুররা গ্রহণ করল। তারপর অমৃত কুম্ভ হাতে উঠলেন ধন্বন্তরি। দেবতায় ও অসুরে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত অসুরেরাই তা পেল। বিষ্ণু তখন মোহিনী নারীর মূর্তিতে অসুরদের ভুলিয়ে সেই অমৃত হরণ করলেন। অমৃত হারিয়ে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের খানিকক্ষণ যুদ্ধ হল, বিষজর্জরিত অসুররা হল পরাজিত। তখন দেবতারা বিষ্ণুলোকে গিয়ে অমৃত পান করলেন।

রাহু নামে এক দৈত্য দেবতার রূপ নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে অমৃত পান করতে বসেছিল। অমৃত যখন তার কণ্ঠ পর্যন্ত প্রবেশ করেছে তখন সূর্য ও চন্দ্র রাহুকে চিনতে পেরে সকলকে জানিয়ে দেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ রাহুর মাথা কেটে দিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃত পানের ফলে রাহুর মৃত্যু হল না। তার মাথার ভাগ রাহু ও দেহের অংশ কেতু নামে পরিচিত হল। আর চন্দ্র সূর্য হলেন রাহুর চির শত্রু। আজও রাহু চন্দ্র সূর্যকে গ্রাস করে গ্রহণের সময়।

সমুদ্রমন্থনে শুধু অমৃত নয়, কালকূটও উঠেছিল। কেউ বলেন প্রথমেই উঠেছিল, কেউ বলেন সকলের শেষে। সেই বিষে দেবতা ও অসুরেরা অচেতন হয়ে পড়েছিল। ব্রহ্মা শিবের শরণ নিলেন, আর শিব জগতের কল্যাণের জন্য সেই বিষ অবলীলায় পান করে নীলকণ্ঠ হলেন।

মিসেস খুরানা আমাকে অনেকক্ষণ নীরব থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন?

বললুম: না। সমুদ্রমন্থনের স্বপ্ন দেখছিলাম। সেখানেও দেবতারা অসুরদের ঠকিয়েছে।

মিসেস খুররানা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: বিচিত্র মানুষ আপনি!

কেন!

মানুষ সম্বন্ধেই আপনার কোন কৌতূহল নেই।

মানুষকে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। তার সম্বন্ধে আবার কী কৌতূহল থাকবে!

মিসেস খুরানা নিজের দিকে একবার তাকালেন, নিজের সাজসজ্জার দিকেও। তারপর শ্রান্ত ভাবে তাকালেন আকাশের দিকে। সায়াহ্নের আকাশ লাল রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। আর কিছুক্ষণ পরে এই রঙ থাকবে না। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত একাকার হয়ে যাবে। তারপর তারা উঠবে একটি দুটি করে। অনেক তারা উঠবে। তাদের অনেক নাম। সপ্তর্ষির নাম, আরও কত নাম তা আমরা জানি নে। জীবনে যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছিলেন, এখনও তাঁরা আকাশে পরিদৃশ্য-মান। তাঁদের সম্বন্ধে আজও আমাদের কৌতূহল আছে অব্যাহত। মিসেস খুরানা এই কৌতূহলের সন্ধান এখনও পান নি।



উপাসনার মন্দিরে আসবার আগে পাধ্যের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আজ লেখা শুরু করলে বুঝি?

সংক্ষেপে উত্তর দিলাম: হ্যাঁ।

পাধ্যে বললেন: অসুরের কথা খুব সাবধানে লিখতে হবে।

কেন?

তা না হলে অসুরকে ঠিক অসুর বলে মনে হবে না।

পাধ্যে এই কথাটি আমাকে বুঝিয়ে বললেন। যে অসুর স্বর্গ রাজ্য অধিকার করেন নি, পৌরাণিক ইতিহাসে তাঁর নাম ওঠে নি, তাঁর অত্যাচারের কথারও কোন উল্লেখ পুরাণে নেই। মোটামুটি ভাবে দেখা যায় যে স্বর্গ রাজ্যে হানা দেবার জন্যেই অসুরেরা নিন্দিত হয়েছেন। সে নিন্দাও প্রায় একই ধরনের, অর্থাৎ তাঁদের অত্যাচারে ত্রিভুবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত, দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হতেন, ব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ নষ্ট হত, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের যজ্ঞের ভাগ তো দেবতারাই পেতেন, কাজেই দেবতারা স্বর্গচ্যুত হলে ব্রাহ্মণের যজ্ঞও নষ্ট হত। এ সব কোন অত্যাচারের কথা বলে পাধ্যে মনে করেন না। দেবতাদের দলবদ্ধ হয়ে বিষ্ণুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে যাবার জন্য একটা ছুতো। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব, এই তিনজন দেবা-

সুরের বিবাদের উর্ধ্বে ছিলেন। অসুরেরাও তপস্যায় এঁদের তুষ্ট করে বর লাভ করতেন এবং বাহু বলে দেবতাদের বিতাড়িত করতেন স্বর্গ থেকে। তারপর দেবতারা কৌশলে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করতেন। সে নিজেদের বাহু বলে নয়, পৃথিবীর পালন কর্তা বিষ্ণুর সাহায্যে। পিতামহ ব্রহ্মাকে দেবতারা বোঝাতেন যে অসুররা বড অত্যাচারী হয়ে উঠেছে, আর দেরি করলে সৃষ্টি রসাতলে যাবে। সরল বিশ্বাসী ব্রহ্মা তখন দেবতাদের বিষ্ণুর কাছে নিয়ে যেতেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে অসুরদের কথা আরও মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করতে হবে।

আমি বললাম: আমার আরও একটা অসুবিধা হচ্ছে। সকল অসুরের কথা না জানতে পারলে গুছিয়ে কিছু লিখতে পারছি না।

পাধ্যে আমার কথা বোধহয় ঠিক ধরতে পারেন নি। তাই আবার বললাম: এই যেমন বিরোচনের কথা। তিনি প্রহ্লাদের পুত্র, কিন্তু রাজ্যের ভার প্রহ্লাদ তাঁর পৌত্র বলির হাতে দিয়ে গেলেন। বিরোচন কি তার আগেই মারা গিয়েছিলেন?

পাধ্যে বললেন: এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে একটা গল্প বলতে পারি। বিরোচনের সম্বন্ধে প্রহ্লাদের খুব ভাল ধারণা ছিল না।

গুরুজী বিরোচনের কোন গল্প আমাদের বলেন নি বলে আমি কৌতূহলী হলাম।

পাধ্যে বললেন: কেশিনী নামে এক সুন্দরী কন্যার স্বয়ম্বর সভায় আমরা বিরোচনকে দেখতে পাই। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সেই প্রশ্ন উঠেছিল। স্থির হয়েছিল যে শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনিই কেশিনীকে বিবাহ করবেন। পণ ছিল জীবনের, হেরে গেলে প্রাণ দিতে হবে। আর বিচার করবেন প্রহ্লাদ। খুবই বিস্ময়ের বিষয় এই যে পুত্রের প্রাণ সংশয় জেনেও প্রহ্লাদ ঋষিপুত্র সুধন্বাকেই শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করলেন।

আমি বললাম: তবে তো আমার প্রশ্নের মীমাংসা হয়েই গেল।

পাধ্যে বললেন: হল না। সুধন্বার কাছে প্রহ্লাদ তাঁর পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করেছিলেন, আর বিরোচনকে মুক্তি দিয়েছিলেন সুধন্বা। এই কাহিনী মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে আছে।

গুরুজী আজ নূতন কোন কথা বলবার আগে বললেন: সকলের মনেই কিছু কিছু প্রশ্ন জেগেছে বলে মনে হচ্ছে। জাগবেই। গভীর অভিনিবেশে যাঁরা পুরাণ পড়বেন, তাঁদের চোখে নানা অসঙ্গতি ধরা পড়বে, অসম্পূর্ণ আখ্যানের জন্য মন অতৃপ্ত হবে। পুরাণের অসঙ্গতির কথা বলতে গেলে কোন কথারই শেষ হবে না,

কেন না অসঙ্গতির শেষ নেই।

তারপরে তাউজীর দিকে তাকিয়ে বললেন : আমার মনে হয় এই অসঙ্গতির বিষয়ে একটু ইঙ্গিত দিলেই যথেষ্ট হবে।

গুরুজী একটুখানি ভাবলেন, তারপর বললেন : কূর্মপুরাণ থেকে বলি। এই পুরাণের মতে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হয়েছিল হিরণ্যাক্ষের আগে।

তাউজী বলে উঠলেন : কিন্তু বরাহ অবতার যে নৃসিংহ অবতারের আগে!

গুরুজী হেসে বললেন : তাইতো সবার ধারণা। কিন্তু সব পুরাণের এক মত নয়। কূর্মপুরাণের মতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছে দিব্য বর লাভ করেছিলেন। তারপর তাঁর বলে পীড়িত ও তাড়িত হয়ে মহর্ষি ও দেবতারা ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা তাঁদের বিষ্ণুর কাছে নিয়ে যান। বিষ্ণু তখনই এক বিরাটকায় ভয়ঙ্কর পুরুষ সৃষ্টি করে দৈত্য বধের জন্য পাঠালেন। গরুড়ারূঢ় এই পুরুষকে দেখে দৈত্যরা বিষ্ণু বলেই মনে করেছিল। প্রথমে যুদ্ধ হয়েছিল হিরণ্যকশিপুর পুত্রদের সঙ্গে। তারা পরাজিত হতেই হিরণ্যকশিপু নিজে এলেন যুদ্ধে। তাঁর পায়ের এক আঘাতেই পীড়িত হয়ে সেই পুরুষ পালিয়ে গেলেন। তখন বিষ্ণু স্বয়ং নরসিংহরূপে যুদ্ধ করতে এলেন। প্রহ্লাদ পরাজিত হলে হিরণ্যাক্ষ এলেন, তাঁর পাশুপত অস্ত্র ব্যর্থ হবার পরে এলেন হিরণ্যকশিপু। নরসিংহের হাতে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হল।

একটু থেমে গুরুজী বললেন : এই কূর্মপুরাণে আরও একটি নতুন কথা আছে। প্রহ্লাদকে বলা হয়েছে হিরণ্যকশিপুর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং প্রহ্লাদই পিতার মৃত্যুর পরে হিরণ্যাক্ষকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

এই কথা শুনে আমরা সকলেই আশ্চর্য হলাম। প্রহ্লাদকে আমরা হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ পুত্র বলে জানি। আর জানি যে হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু হয়েছিল হিরণ্যকশিপুর পূর্বে, হিরণ্যকশিপুর পরে প্রহ্লাদ রাজা হয়েছিলেন।

গুরুজী বললেন : হিরণ্যাক্ষ বধের গল্পটিও কিছু অন্য রকম। হিরণ্যাক্ষ রাজা হয়ে দেবতাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পীড়ন করতে আরম্ভ করেন। তারপর ইন্দ্র ও দেবতাদের জয় করে তাদের প্রভা নষ্ট করেন এবং পৃথিবীকে বেঁধে রসাতলে নিয়ে যান। দেবতারা আবার গেলেন ব্রহ্মার কাছে, সেখান থেকে বিষ্ণুর কাছে, বিষ্ণু বরাহ রূপ ধারণ করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করলেন।

কূর্মপুরাণে নতুন কথা আরও আছে। প্রহ্লাদ রাজা হবার পরে তাঁর অসুর ভাব পরিত্যাগ করেছিলেন। তার মানে, তিনি বিষ্ণুভক্ত হয়েছিলেন পরিণত বয়সে সব দেখে শুনে।

আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। প্রহ্লাদকে আমরা শৈশব থেকেই

চিনি। এমন বিষ্ণুভক্ত বালক সমগ্র পুরাণে দুটির বেশি আছে কিনা সন্দেহ। কূর্মপুরাণের কথা মানতে হলে আমাদের একটি প্রিয় গল্পের আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

গুরুজী বললেন: কূর্মপুরাণে প্রহ্লাদের কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। বিষ্ণু তৎপর হয়ে রাজ্য পালনের জন্য প্রহ্লাদের রাজ্য অরাতিশূন্য হয়েছিল। কিন্তু দেবতাদের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে একবার তিনি একজন গৃহাগত তপস্বী ব্রাহ্মণের পূজা করেন নি। সেই ব্রাহ্মণের শাপে তাঁর বৈষ্ণবী শক্তি নষ্ট হয়। প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণের অবমাননা ও তাঁর পিতৃহন্তা বিষ্ণুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। তারপরে তাঁর ঘোর যুদ্ধ হয় বিষ্ণুর সঙ্গে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁর চৈতন্য ফিরে এসেছিল। তিনি রাজ্য ত্যাগ করে যোগাবলম্বন করেন।

প্রহ্লাদের পরে রাজা হয়েছিলেন হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক। মহাদেবকে তপস্যায় প্রীত করে হিরণ্যাক্ষ এই পুত্র লাভ করেছিলেন। শিবের দেহসম্ভূত পুত্র। কিন্তু বামন হয়ে সে চাঁদে হাত বাড়াল। মন্দার পর্বতবাসিনী ভগবতী পার্বতীকে কামনা করল। শিব তখন ভৈরবকে দুষ্ট নিগ্রহের ভার দিয়ে পৃথিবীতে বসবাস করছিলেন। পার্বতী তাঁর পুত্রদের পাঠিয়েছিলেন বিষ্ণুর কাছে, আর ইন্দ্রাদি দেবতারা স্ত্রীমূর্তি ধারণ করে পার্বতীর সেবা করছিলেন। এমন সময়ে যুদ্ধ করে পার্বতীকে হরণ করবার জন্য অন্ধক এসে উপস্থিত হল।

প্রথমেই যুদ্ধ হল ভৈরবের সঙ্গে। ভৈরব শূল দিয়ে অন্ধককে বিদীর্ণ করতেই সে সহস্র দৈত্য সৃষ্টি করল। বিষ্ণু তখন একশো দেবীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠালেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অন্ধক পালিয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার যখন সে মন্দার পর্বতে যুদ্ধ করতে এল, তখন শিব ফিরে এসেছেন। বিষ্ণু তাঁকে এই অসুর বধ করতে বললেন। শিব কিন্তু তাকে শূলাগ্রে নিয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। অন্ধকের পাপক্ষয় হয়ে জ্ঞানোদয় হল। সে শিবের স্তব করে পার্বতীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করল। পার্বতী তাকে ক্ষমা করে পুত্রবৎ গ্রহণ করলেন।

গুরুজী বললেন: এই অন্ধক একটু বিপদ সৃষ্টি করেছে। পুরাণান্তরে হিরণ্যাক্ষ্যের যেসব পুত্রের নামপাওয়া যায় তার মধ্যে অন্ধক নেই। রামায়ণে অন্ধক নামে এক অন্ধ মুনি-দম্পতির উল্লেখ আছে। আর অন্ধক নামে এক দৈত্যের কথাও পুরাণে পাওয়া যায়। কিন্তু সে কশ্যপ ও দিতির পুত্র। তার মানে হিরণ্যাক্ষের ভাই, পুত্র নয়। দিতির পুত্রেরা দেবতাদের হাতে নিহত হলে দিতি কশ্যপের নিকট দেবতার অবধ্য এক পুত্র কামনা করেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে কশ্যপ তাঁকে আলিঙ্গন করতেই তাঁর আঙুল থেকে এক পুত্রের জন্ম হল। বীভৎস তার

দেহ। এক হাজার হাত ও দু হাজার পা, চোখও দু হাজার। দৃষ্টিমান হয়েও সে অন্ধের মতো চলত, তাই তার নাম হল অন্ধক। ত্রিভুবনের কোন্ প্রাণীর উপরে কী অত্যাচার করেছিল জানা নেই, দেবতারা মহাদেবের কাছে গিয়েছিলেন তাকে বধের প্রার্থনা নিয়ে। এক দিন তার কলহ হল মহাদেবের সঙ্গে। অন্ধক নারদের গলায় মন্দারের মালা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, মন্দার পর্বতে গিয়েছিল ফুলের জন্য। সেখানেই মহাদেবের সঙ্গে বিবাদ করে নিহত হল।

গুরুজী বললেন: এই অন্ধকের গল্প সম্পূর্ণ ভাবে কল্পিত মনে হয়। অসুরদের আকৃতি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অন্য রকম ছিল, এ রকম কথা আমরা আগে কোথাও পাই নি। তার জন্মকথাও অবিশ্বাস্য। এই সমস্ত গল্প পরবর্তী কালে পুরাণে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, এ কথা মেনে নিলেই অসঙ্গতি মিটে যায়।

হিরণ্যাক্ষের বংশে আর একটি পরাক্রান্ত অসুরের জন্ম হয়। তাঁর নাম দুর্গাসুর বা দুর্গমাসুর। যুদ্ধে সে অজেয় ছিল এবং দেবতাদের বল চির দিনের জন্য খর্ব করবার চেষ্টা করেছিল। সে মনে করেছিল যে বেদই দেবতাদের শক্তির উৎস, তাই ব্রাহ্মণদের বেদ মন্ত্র বিস্মরণ করিয়ে সে দেবতাদের শক্তি অপহরণ করেছিল। ব্রহ্মার বরে সে দেবতাদের পরাজিত করে অমরাবতী অধিকার করে। যজ্ঞের অভাবে দেশে বারিপাত বন্ধ হয়ে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হল। ব্রাহ্মণেরা তখন হিমালয়ে গিয়ে দেবীর শরণাপন্ন হলেন। দেবী রাজী হলেন অসুর বধে।

দূতের মুখে দুর্গাসুর এ সংবাদ পেল, তারপর সহস্র অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে উপস্থিত হল। তার আয়োজন দেখে সবাই শঙ্কিত হয়েছিলেন, কিন্তু দেবীর হাতে সানুচর দুর্গাসুর নিহত হল। এই দুর্গাসুরকে বধ করেই দেবীর নাম হল দুর্গা।

কূর্মপুরাণের মতে অন্ধকের পরে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন রাজা হয়েছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে জয় করে ত্রিভুবন পালন করেছিলেন ধর্মানুসারে। তারপর একদিন বিষ্ণুর আদেশে সনৎকুমার এসে তাঁর প্রশংসা করলেন। বিরোচন তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে সনৎকুমারের কাছে আত্মজ্ঞান ধর্ম গ্রহণ করলেন। তারপর পুত্র বলির হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে যোগাভ্যাসে মন দিলেন।

বলির কাহিনী আমরা আগেই শুনেছি। এই বংশের অসুরদের কথা শুনে কারও প্রতি আমার বিরাগ জন্মাল না, বরং শ্রদ্ধা জাগল সকলের প্রতি। সকলেই শক্তিমান, সত্যবাদী, ধার্মিক, প্রজাপালক। এঁরা সাধারণ মানুষের উপর কোন অত্যাচার করেন নি, অশ্রদ্ধা করেন নি মুনি ঋষিদের, নারীর অসম্মান কোন দিন করেন নি। এদের চরিত্রহীনতার কোন কাহিনী এখনও আমরা শুনি নি। গুরুজী

বললেন : বলিতেই এই বংশের শেষ নয়। বলির পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণ রাজা হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পরম শিবভক্ত। ইন্দ্রকে পরাজিত করে তিনিও ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন।

এই সময়ে আমার একটি কথা মনে এল। হিরণ্যকশিপুর বংশে আমরা তিন দেবতার উপাসনা দেখি। প্রথমে ব্রহ্মার উপাসনা, পরে বিষ্ণু ও শিবের। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার উপাসনা করেছিলেন। ব্রহ্মা তাঁদের অমরত্বের বর দেন নি। তাই বিষ্ণু তাঁদের বধ করেছিলেন। তারপর প্রহ্লাদ, বিরোচন ও বলি করেছিলেন বিষ্ণুর উপাসনা। তাঁদের মৃত্যু হয় নি কোন দেবতার হাতে। শিবের তপস্যা করে হিরণ্যাক্ষ অন্ধককে লাভ করেছিলেন বলে অন্ধক বিষ্ণুর অবধ্য ছিলেন। তেমনি বাণও ছিলেন শিবের ভক্ত।

গুরুজী বললেন : পরাজিত নিগৃহীত ইন্দ্র শিবের শরণ নিয়েছিলেন, বলেছিলেন বাণের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন। ইন্দ্রের অনুযোগে বিরক্ত হয়ে মহাদেব একটি শর নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই শরে বাণের পুরী ভস্মীভূত হয়ে যায়। কিন্তু বাণের মৃত্যু হয় না। তিনি পুরীতে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ মাথায় নিয়ে পুরী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ভক্তিতে প্রীত হয়ে মহাদেব তাঁকে গাণপত্য পদ প্রদান করেন।

বলির এক শত পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে বাণই জ্যেষ্ঠ। ধৃতরাষ্ট্র সূর্য চন্দ্রমা কুণ্ডনাভ গর্দভাক্ষ কুক্ষি প্রভৃতি আরও কয়েকটি পুত্রের নাম আমরা জানি। কিন্তু এদের কোন কাহিনী আমাদের জানা নেই। যে কাহিনী সুবিদিত তা বাণের কন্যা উষার। পুরাণে এটি একটি প্রিয় গল্প।

উষা হরণের কাহিনী আমার মনে পড়ল, কিন্তু এ কাহিনী কোথায় পড়েছি তা মনে পড়ল না।

গুরুজী বললেন : বাণ তখন শোনিতপুরের রাজা। পার্বতীর শাপভ্রষ্টা পারিপার্শ্বিকা উষা তাঁর কন্যা। উষা একদিন পার্বতীকে মহাদেবের সঙ্গে ক্রীড়া করতে দেখেন। কুমারী উষার মনেও জাগল কামনা। পার্বতীর কাছে তিনি তাঁর কামনার কথা নিবেদন করলেন। পার্বতী এই সরলতায় সন্তুষ্ট হয়ে উষাকে বর দিলেন, যে-পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করবে, সেই হবে তোমার স্বামী। তারপর উষা এক দিন সত্যিই স্বপ্ন দেখলেন। একজন অজ্ঞাত অপরিচিত সুপুরুষ তার সঙ্গে বিহার করছে। জেগে উঠে সখী চিত্রলেখাকে এই গল্প শোনালেন। বললেন, পার্বতীর কথা মিথ্যা হবে না, মনে মনে সেই পুরুষকেই আমি বরণ করেছি।

কিন্তু কে সেই পুরুষ! কোথায় তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে! কে তাঁর সন্ধান দেবে! অনেক ভেবে চিন্তে চিত্রলেখা ছবি আঁকলেন অনেক। নানা জনের ছবি। একে একে সেগুলি দেখালেন উষাকে। তাঁর মধ্যে একটি ছবি দেখে উষা বললেন, এই সেই পুরুষ, এঁকেই আমি স্বপ্নে দেখেছি।

সানন্দে চিত্রলেখা বললেন, ইনি যে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এঁর পিতা। দ্বারকায় কে তাঁকে সংবাদ দিতে যাবে!

শেষ পর্যন্ত চিত্রলেখা নিজেই গেলেন দ্বারকায়। অনিরুদ্ধকে সেখান থেকে শোনিতপুরে আনতে হবে। কেমন করে এই কাজ উদ্ধার হবে চিত্রলেখা সেই কথা ভাবছিলেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। সব কথা শুনে তিনি বললেন, তোমাকে আমি তামসী বিদ্যা শেখাচ্ছি। এর প্রভাবে সবাই মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তুমি অনিরুদ্ধকে নিয়ে নির্ভাবনায় পলায়ন করতে পারবে।

নারদের কাছে চিত্রলেখা তামসী বিদ্যা শিখলেন, আর সেই বিদ্যার প্রভাবে সবাইকে মোহাচ্ছন্ন করে অনিরুদ্ধকে নিয়ে পলায়ন করলেন। নারদ তাঁর কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে ভুললেন না। যথা সময়ে এই কথা তিনি কৃষ্ণের গোচর করলেন।

দ্বারকা থেকে অনিরুদ্ধ এলেন শোনিতপুরে। গোপনে গন্ধর্ব মতে উষাকে বিবাহ করলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদে অনিরুদ্ধর অনধিকার প্রবেশের সংবাদ পেয়ে অসুররাজ বাণ তাঁকে বন্দী করলেন।

এ দিকে কৃষ্ণ বলরাম প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যদু বীরেরা এসে শোনিতপুর আক্রমণ করলেন। যুদ্ধ বাধল বাণের সঙ্গে। মহাদেব স্কন্দকে নিয়ে বাণের পক্ষে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তাঁরা পরাজিত হলেন। বাণ বাধ্য হলেন অনিরুদ্ধর সঙ্গে উষার বিবাহ দিতে। বিবাহের পর অনিরুদ্ধ উষাকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

গুরুজী বললেন: এই কাহিনী আছে বিষ্ণুপুরাণে। কিন্তু এও প্রক্ষিপ্ত কাহিনী বলে মনে হয়।

তাউজী সামনের দিকে বসেছিলেন, বললেন: কেন?

গুরুজী বললেন: কৃষ্ণ দ্বাপরের মানুষ। এতক্ষণ আমরা যে সব অসুরের কথা আলোচনা করছিলাম তাঁরা সবাই ছিলেন সত্য যুগে। মাঝখানে ত্রেতা যুগ পেরিয়ে আমরা দ্বাপরে পৌঁছে যাব, এ এক রকম অসম্ভব মনে হচ্ছে।

তারপরে বললেন: আসামে তেজপুর নামে একটা জায়গা আছে। সেখানকার অধিবাসী তেজপুরকেই শোনিতপুর বলে নির্দেশ করেন। মহাভারতের যুগে শোনিতপুরের রাজা হয়তো বাণ ছিলেন, যেমন ভগদত্ত ছিলেন কামরূপের রাজা,

কিন্তু এই বাণ নিশ্চয়ই বলির পুত্র নন, তাহলে প্রহ্লাদ বিরোচন ও বলিকেও আমরা মহাভারতে দেখতে পেতাম।

গুরুজীর এই মন্তব্য আমার কাছে সত্য বলে মনে হল। বাণ যদি বলির পুত্র হতেন তাহলে কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হতেন না। বাণ ইন্দ্র-বিজয়ী ত্রিভুবনপতি। ভারতের এক প্রান্তে শোনিতপুরে তিনি রাজধানী স্থাপন করে থাকতেন না। থাকলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে কোনও এক পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করতেন তাতে সন্দেহ নেই।

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে গুরুজী বললেন : পুরাণের কোন ঘটনাকে ঠিক এই ভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার কারণ এ রকম ঘটনা একটি দুটি নয়, অনেক আছে। মহাভারতেই আমরা হিরণ্যকশিপুর পৌত্র নিবাত কবচের নাম দেখি। নিবাত কবচ প্রহ্লাদের এক ভাই সংহ্রাদের পুত্র। অগ্নিপুরাণে নিবাত কবচ একজন, কিন্তু মহাভারতে তারা সংখ্যায় প্রায় তিন কোটি। তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে তারা দুটি বর পেয়েছিল। তারা দেবতাদের অবধ্য হবে ও নিরাপদে সমুদ্রে বাস করবে। কাজেই দেবতাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করবার সুযোগ তারা পেয়েছিল। ইন্দ্র নিজেকে অসহায় বোধ করতেন।

নিবাত কবচের কথা আমার মনে পড়ল না। অনেক প্রশ্ন নিয়ে অনেকেই গুরুজীর মুখের দিকে তাকালেন। গুরুজী এই কৌতুহল লক্ষ্য করে বললেন : অর্জুনের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। বনবাস কালে অর্জুন একবার স্বর্গে গিয়েছিলেন। ইন্দ্রের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে যখন গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন তখন ইন্দ্র বললেন, নিবাত কবচদের তুমি বিনাশ কর। ভীষণ যুদ্ধে অর্জুন তাদের বধ করেছিলেন। তাঁর রথের সারথি ছিল মাতলি। মাতলি ইন্দ্রের সারথি।

তাউজী করুণ ভাবে বললেন : তবে উপায় ?

মেনে নেওয়াই একমাত্র উপায়। অবশ্য নিবাত কবচের গল্পটা মেনে নেবার বাধা কিছুই নেই। বললেই হল যে অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন নিবাত কবচ বংশের তিন কোটি অসুরের সঙ্গে। এক থেকে তিন কোটি হতে তাদের তিন যুগ সময় লেগেছিল। কিন্তু এই রকমের যুক্তি দিয়ে উষা-অনিরুদ্ধের গল্পটা ঠিক মেলানো যায় না। তখন ধরে নিতে হয় যে এদের বয়সের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

গুরুজীর আর একটি নাম মনে পড়ে গেল। বললেন : বলির কন্যা বজ্রজ্বালাকে আমরা ত্রেতাযুগে দেখি। তিনি ছিলেন রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের স্ত্রী। কেউ তাঁকে বলির কন্যা বলে, কেউ বলে বলির দৌহিত্রী। বলির পৌত্রী উষার কাহিনী

আমরা দ্বাপরে পেয়েছি। সন তারিখের অঙ্ক দিয়ে এর হিসাব মেলানো যাবে না। আর এত দিন পরে তার প্রয়োজনই বা কী !



গুরুজী বললেন : অসুর কুলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে যে বিবাহ প্রচলিত ছিল, পুরাণে তার প্রমাণ আছে। হিরণ্যকশিপুর ভগিনীর নাম সিংহিকা। তাঁর বিবাহ হয়েছিল বিপ্রচিত্তি দানবের সঙ্গে। হিরণ্যকশিপুর মাতা দিতি ও বিপ্রচিত্তির মাতার নাম দনু। দুজনেই দক্ষ প্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপের স্ত্রী ছিলেন। দনুর পুত্ররা পুরাণে দানব নামে পরিচিত, যেমন দিতির পুত্ররা দৈত্য নামে পরিচিত।

ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহেরও নিদর্শন আছে। অন্যতম কশ্যপের স্ত্রী অদিতির পুত্র ইন্দ্র বিবাহ করেছিলেন দনুর পুত্র পুলোমা দানবের কন্যা শচীকে। কিন্তু এই বিবাহ শাস্ত্র সম্মত ছিল কিনা বলা যায় না। তার কারণ ইন্দ্র শচীর সতীত্ব নাশ করেছিলেন আগে, তার পর তার পিতার শাপের ভয়ে হত্যা করেছিলেন তাকে।

গুরুজী এর পরে বিপ্রচিত্তির কথা বললেন :

সমুদ্র মন্থনের পরে দেবাসুরে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বিপ্রচিত্তি সেনাপতি ছিলেন। দেবতাদের সঙ্গে তিনি আট বার যুদ্ধ করেছিলেন। নবম বারের যুদ্ধে ইন্দ্রের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

মহাভারতে আমরা দক্ষকন্যা দনুর পুত্রের সংখ্যা দেখি চল্লিশ। তাদের মধ্যে বিপ্রচিত্তিই প্রথমে রাজা হয়েছিলেন। দানবদের আমরা অনেক নাম পাই। শম্বর নমুচি পুলোমা অসিলোমা কেশী কেতুমান অশ্বপতি বৃষপর্বা একচক্র বিরূপাক্ষ মহোদর নিকুম্ভ সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি। এই সূর্য চন্দ্র দেবতা নন। ভাগবতে আমরা একষট্টি জন দানবের উল্লেখ দেখি। তাদের মধ্যে আঠারো জন প্রধান। শম্বর অরিষ্ট হয়গ্রীব বিভাবসু পুলোমা বৃষপর্বা একচক্র বিরূপাক্ষ বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি।

বিপ্রচিত্তি দানবের প্রথম রাজা, আবার সমুদ্র মন্থনের সময় তাকে দৈত্যরাজ বলির সেনাপতি রূপে দেখি। মনে হয় যে বলি সে যুগে একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, আর তাঁর সভায় ছোট বড় অনেক রাজা তাঁর মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতি পদ অলঙ্কৃত

করেছিলেন।

গুরুজী ববলেন : শম্বর দানবকেও আমরা হিরণ্যকশিপুর সভাসদ রূপে দেখেছি। শম্বর মায়াবী ছিলেন। প্রহ্লাদকে নানা উপায়ে বধ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে হিরণ্যকশিপু শম্বরকে বলেছিলেন, শম্বর, আমরা এই দুর্বুদ্ধি বালককে বিনাশ করতে পারলাম না, তুমি মায়াবী মায়ার দ্বারা একে বিনাশ কর।

শম্বর এ কথার উত্তরে বলেছিলেন, আমি শত সহস্র কোটি প্রকার মায়া অবগত আছি। আপনি আমার মায়াবল প্রত্যক্ষ করুন।

তারপর শম্বর তাঁর মায়াজাল বিস্তার করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রহ্লাদকে বিনষ্ট করতে পারেন নি। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে শম্বরের সমস্ত মায়া বিনষ্ট হয়েছিল।

দ্বাপরে আবার আমরা এই শম্বরকে দেখতে পাই। কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছিলেন।

তাউজী আস্তে আস্তে বললেন : বড় দুশ্চিন্তার কথা।

গুরুজী সহাস্যে বললেন : দুশ্চিন্তার কথাই। হিরণ্যকশিপু যে সত্য যুগের মানুষ তাতে কারও সন্দেহ নেই। কাজেই যে শম্বর শিরণ্যকশিপুর সভায় ছিলেন, তাকেই আবার দ্বাপরে দেখতে ইচ্ছা করে না। দ্বাপরের শম্বরকে অন্য শম্বর বলে ধরে নিলেই সুবিধা হয়।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন : তা কি ধরে নেওয়া যায় ?

গুরুজী বললেন : তারও অনেক বাধা আছে।

তাউজী এবারে অন্য কোন প্রশ্ন না করে নীরবে গুরুজীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গুরুজী বললেন : আমরা আরও কয়েকজন দনুর পুত্রের নাম পাই যাঁরা কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়েছেন। মহাভারত বা শ্রীমদ্ভাগবতে এই সব গল্প আছে।

এমন সংক্ষিপ্ত উত্তরে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি হল না। আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে গুরুজী বললেন : অরিষ্ট কংসের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কংস তাঁকে নন্দালয়ে পাঠিয়েছিলেন কৃষ্ণকে বধ করবার জন্য। অরিষ্ট বৃষভের রূপ ধারণ করে কৃষ্ণকে আক্রমণ করলে কৃষ্ণ এঁর শৃঙ্গ ধরে পীড়ন করেন ও শৃঙ্গ উৎপাটিত করে অরিষ্টকে বধ করেন।

তারপর কেশী দানবের কথা। কেশীও কংসের অনুচর ছিলেন, এবং কংস তাকেও কৃষ্ণ বধের জন্য বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। কেশী অশ্বের রূপ ধারণ করে বৃন্দাবনে এসে গোপগণের গাভী বধ করতে আরম্ভ করে। কৃষ্ণ কাছে এলে তাঁকে গ্রাস করতে চেয়েছিল। কৃষ্ণ তার মুখের ভিতর হাত দিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে কেশীকে

বধ করেন।

এই দুজন দানবের কথা আমরা মহাভারতে পড়েছিলাম। কেশীকে বধ করে কৃষ্ণের নাম হয়েছিল কেশব। গুরুজী খুব সংক্ষেপে এদের গল্প বললেন। তারপরে আরও দুজন দানবের নাম করলেন। বজ্রনাভ ও নিকুম্ভ। কৃষ্ণ যখন দ্বারকার রাজা তখন বিবাদ হয়েছিল এদের সঙ্গে। শম্বরের ঘটনাও ঘটেছিল এই সময়ে।

গুরুজী বললেন : দৈত্য ও দানবেরা দেবতাদেরই সমসাময়িক। সবাই কশ্যপের পুত্র। কশ্যপ একই সঙ্গে দক্ষ প্রজাপতির তেরটি কন্যার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা সেই কন্যাদেরই সন্ততি। কিন্তু পুরাণে আমরা এদের কাউকে সত্য যুগে দেখছি, কাউকে ত্রেতায়, কাউকে আবার দ্বাপরে দেখছি।

তাউজী প্রশ্ন করলেন : এদের কি আমরা ত্রেতা যুগেও দেখতে পাই ?

গুরুজী বললেন : পাই বইকি। রামায়ণে মহোদরের নাম নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে !

আমরা কোন উত্তর দিলাম না।

গুরুজী বললেন : সীতার অন্বেষণে হনুমান অশোক বনে গিয়েছিলেন। তারপর সীতার কাছ থেকে অভিজ্ঞান সংগ্রহ করে ফেরার সময় অশোক বন ধ্বংস করেন। হনুমানকে দমন করবার জন্য রাবণ যাদের পাঠিয়েছিলেন মহোদর তাদেরই একজন। হনুমানের হাতে তার মৃত্যু হয়।

তাউজী বললেন : আরও বিপদের কথা।

গুরুজী হেসে বললেন : বিপদ যতই হোক, বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার পেতেই হবে। এখন আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের রাক্ষস ও দৈত্যদের আলোচনা করব না। যাদের আমরা প্রাচীনতর বলে জানি, আগে তাদের আলোচনাই করব।

তাউজী আর কোন কথা কইলেন না। গুরুজীও খানিকক্ষণ নীরবে ভাবলেন, তারপরে বললেন : অসিতলোমা নামে একজন দানব ব্রহ্মার বরে দুর্ধর্ষ হয়েছিলেন। সমগ্র পৃথিবী জয় করবার পর তিনি স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে দেবতাদের নির্বাসিত করেন। স্বর্গচ্যুত দেবতারা এসে বিষ্ণুর শরণ নিলেন। তারপর—

তারপরের ঘটনা আমরা অনুমান করতে পারি। তারপর বিষ্ণু কোন মূর্তিতে এসে দানবকে বধ করেছিলেন।

গুরুজী একটু থেমে বললেন : দেবী ভাগবতের কথা বলে কাহিনী একটু অন্য রকম। বিষ্ণু নিজে তাকে বধ করেন নি। তাঁর শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মী। মহালক্ষ্মীর হাতেই অসিতলোমা নিহত হয়।

সকল দানবেরই এই রকম কাহিনী আছে। কারও ছোট, কারও বড়। কারও একার পুত্রকন্যারও কাহিনী আছে। বিপ্রচিত্তি দানবের কাহিনী আগে বলেছি। এবারে তার পুত্রদের কাহিনী বলি তাদের নাম নমুচি রাহু ও কেতু।

নমুচি একজন বিখ্যাত অসুর। তার কাহিনী শুধু মহাভারতে নয়, ঋগ্বেদে ও শত পথ ব্রাহ্মণেও আছে। পুরাণে আমরা তিনজন নমুচি দেখি। দ্বিতীয় নমুচি কশ্যপ ও দনুর পুত্র। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ইন্দ্রের হাতে। আর তৃতীয় নমুচি বিপ্রচিত্তি দানবের পুত্র, কশ্যপের পৌত্র। এই নমুচির হাতে ইন্দ্র পরাজিত হয়েছিলেন। প্রথমে দুজনের বন্ধুতা ছিল, পরে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সোমরসের সঙ্গে নমুচি ইন্দ্রের বল হরণ করে। তারপর এই শর্তে ইন্দ্রকে মুক্তি দেয় যে দিবসে বা রাত্রে শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দিয়ে ইন্দ্র নমুচিকে বধ করবেন না। ইন্দ্র এই শর্তে রাজী হয়েই মুক্তি নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সংকল্প রক্ষা করেন নি। সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমারদের কাছ থেকে সমুদ্রফেনবৎ বজ্র লাভ করে গোধূলি বেলায় নমুচিকে বধ করেন। নমুচির ছিন্ন মস্তক ইন্দ্রকে ধিক্কার দিয়েছিল, ধিক্, এই কি দেবতার বন্ধুতা! প্রতি শ্রুতিরও কোন মূল্য নেই! পাপাত্মা দেবরাজ, তোমাকে ধিক্!

নমুচির এই ছিন্ন মস্তকের ভয়ে ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণ নিয়েছিলেন। তারপর পিতামহের উপদেশে অরুণা নদীতে স্নান করে পাপ মুক্ত হন।

মহাভারতে নমুচির এই কাহিনী আছে।

বিপ্রচিত্তির আর দুটি পুত্রের নাম সর্বজনবিদিত। রাহু ও কেতু। কেউ এঁদের এক বলেন, কেউ দুই। বিপ্রচিত্তির আরও এক শত পুত্র ছিল, কিন্তু তাদের নাম আমাদের কাছে পরিচিত নয়।

রাহু ও কেতু এখন নবগ্রহের অন্যতম। কেমন করে তারা নবগ্রহে পরিণত হল, তার একটি কাহিনী আছে।

সমুদ্র মন্থনের সময় দেববৈদ্য ধন্বন্তরি সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন অমৃতের কুম্ভ হাতে নিয়ে। তা নিয়ে দেবাসুরে যুদ্ধ হয়েছিল। আর বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণ করে সেই অমৃত-কুম্ভ হরণ করেছিলেন। বাসুকির বিষে জর্জরিত অসুরেরা পরাজিত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাহু দেবতাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। দেবতারা যখন অমৃত পান করতে বসেছিলেন, তখন রাহুও তাঁদের সঙ্গে বসেছিলেন। তাঁর পাতেও অমৃত পড়েছিল। রাহু যখন সেই অমৃত গলাধঃকরণ করছিলেন, তখন ধরা পড়ে গেলেন দেবতাদের কাছে। তাঁকে চিনতে পেরে সূর্য ও চন্দ্র চেঁচিয়ে উঠেছিলেন আর বিষ্ণু এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সুদর্শন চক্রে রাহুর মস্তক ছেদন করেছিলেন। রাহু তখন অমৃত পান করেছিলেন, তাই দ্বিখণ্ডিত হয়েও

তাঁর মৃত্যু হল না। তাঁর মস্তক ভাগ রাহু ও দেহ ভাগ কেতু নামে পরিচিত হল।

সূর্য ও চন্দ্রের শত্রুতার কথা রাহু আজও ভুলতে পারেন নি। আজও আমরা আকাশে তাঁদের শত্রুতা দেখতে পাই। রাহু নবগ্রহের অন্যতম গ্রহ হয়েছেন, নৈঋর্ত কোণের তিনি অধিপতি। তাঁর রথ ধূসর বর্ণের। আটটি কালো ঘোড়া সারাক্ষণ তাতে যুক্ত। চন্দ্রগ্রহণে রাহু সূর্য হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চন্দ্রে অভিযান করেন, আবার সূর্যগ্রহণে চন্দ্র থেকে বেরিয়ে সূর্যে প্রবেশ করেন। রাহু আজও সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করেন বলেই পৃথিবীতে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে।

আমরা ভেবেছিলাম যে এই সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ব্যাপারে কোন বর বা শাপের কথা শুনতে পাব, কিন্তু গুরুজী সে রকম কোন কথা বললেন না। তার বদলে বললেন : এই রকম ছোটখাট অসুর ও দৈত্য দানবের কথা পুরাণে অনেক ছড়িয়ে আছে। তাদের সকলের কথা এক সঙ্গে মনে পড়ে না।

তাউজী বসেছিলেন একেবারে সামনের দিকে গুরুজীর প্রায় মুখোমুখি। তাঁর দিকে চেয়ে গুরুজী বললেন : এদের নামের একটা তালিকা তৈরি করে নিলে ভাল হত।

তাউজী বললেন : তা হত, কিন্তু তার জন্যেও অনেক সময় লাগত। সমস্ত পুরাণ ঘেঁটেই তো তালিকা তৈরি করতে হবে।

গুরুজী বললেন, নিরিবিলি ভাবলে আরও অনেক নাম মনে আসবে।

চেন্নুলু খানিকটা তফাৎ থেকে বলে উঠল : ঋষির কথায় আমরা ইল্বলের কথা শুনেছি। সেও তো অসুর।

গুরুজী বললেন : ঠিক কথা। ইল্বল ও বাতাপি বিপ্রচিত্তির পুত্র, তাদের মাও সিংহিকা।

চেন্নুলু গর্বিত ভাবে একবার স্বপ্নির দিকে তাকাল, আর একবার আমার দিকে।

গুরুজী বললেন : ইল্বল ধনী ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন না। একবার তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাতাপি এক তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন পুত্রের জন্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ সেই বর দান করেন নি। বাতাপি সেই ব্রাহ্মণের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির উপরেই প্রতিহিংসা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হলেন। আর ভ্রাতার অনুরোধে ইল্বলও ব্রাহ্মণ হত্যায় লেগে গেলেন।

দুই ভাই এই ফন্দি করলেন যে বড় ভাই ইল্বল ব্রাহ্মণের বেশে সংস্কৃত শ্লোক বলে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে আনবেন শ্রাদ্ধের ছলে, আর ছোট ভাই বাতাপি

মেষের রূপ ধারণ করে নিজের মাংস দেবেন ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য। ইল্বল মেষ রূপী বাতাপিকে কেটে সেই মাংস রেঁধে ব্রাহ্মণদের খাওয়াতেন। তারপর সবাই খেয়ে উঠলে ইল্বল বাতাপির নাম ধরে ডাকতেন উচ্চৈঃস্বরে। বাতাপি তখন ব্রাহ্মণদের উদর ভেদ করে বেরিয়ে আসতেন। ব্রাহ্মণদের মৃত্যু হত। মহর্ষি অগস্ত্য এই বাতাপিকে বধ করেন।

অগস্ত্য বিবাহ করেছিলেন বিদর্ভ রাজকন্যা লোপামুদ্রাকে। চীর ও বল্কল পরে রাজকন্যা তপস্বিনী হলেন। গঙ্গাতীরে দীর্ঘ দিন তপস্যার পরে অগস্ত্য এক দিন তাঁর কামনা জানালেন লোপামুদ্রাকে। সলজ্জে লোপামুদ্রা বললেন, আমার এই তপস্বিনীর বেশ আমি অপবিত্র করতে চাই নে। উপযুক্ত বসন ভূষণ আভরণে সজ্জিত হয়ে মহার্ঘ শয্যায় আমাদের মিলন হোক।

অগস্ত্য বললেন, তাই হোক।

তারপর অর্থের সন্ধানে ঋষি বেরিয়ে পড়লেন। পর পর তিনজন রাজার কাছে তিনি গেলেন। তাঁদের যত আয় তত ব্যয়। এই রাজাদের নিকট অর্থ নিলে কারও কষ্ট হবে বলে অগস্ত্য তাঁদের সঙ্গে ধনী দানব ইল্বলের নিকট গেলেন।

অন্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে ইল্বল ও বাতাপি যা করেছিলেন, অগস্ত্যের বেলাতেও তাই করলেন। রাজারা ভয়ে তটস্থ হয়ে গেলেন, কিন্তু অগস্ত্য নির্ভীক ভাবে সমস্ত মাংস একাই খেলেন। তারপর ইল্বল যখন বাতাপিকে ডাকতে লাগলেন, তখন কোন সাড়া এল না। অগস্ত্য বললেন, তাকে আর তুমি ফিরে পাবে না, আমি তাকে জীর্ণ করে ফেলেছি।

ইল্বল এই কথা শুনে বিষণ্ণ মনে বললেন, কী চাই আপনাদের বলুন।

অগস্ত্য বললেন, তুমি ধনী বলে শুনেছি। অন্যের ক্ষতি না করে যা দিতে পার, তাই আমাকে দাও।

ইল্বল বললেন, আমি আপনাদের কী দান করতে চাই সে কথা যদি বলতে পারেন, তবেই আমি দেব।

অগস্ত্য বললেন, তুমি এই রাজাদের অযুত ধেনু ও অযুত স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাও, আর আমাকে দিতে চাও দ্বিগুণ। এ ছাড়া দুটি অশ্ব ও একটি সোনার রথ দেবারও তোমার ইচ্ছা হয়েছে।

ইল্বল দুঃখিত মনে তার চেয়েও বেশি ধন দান করলেন।

গুরুজী বললেন : এ হল মহাভারতের গল্প। পুরাণান্তরে গল্পটি কিছু অন্য রকম। এই দুই দানব ভ্রাতাকে শিক্ষা দেবার জন্য দেবতারা অগস্ত্যকে অনুরোধ

করেছিলেন। তারই জন্য ঋষি ইল্বলের অতিথি হয়েছিলেন। তারপর সেই মাংস ভোজনের গল্প। অগস্ত্য যখন বললেন যে বাতাপি তাঁর উদরে জীর্ণ হয়ে যমালয়ে গেছে, তখন ক্রোধে অন্ধ হয়ে ইল্বল অগস্ত্যকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ঋষির কোপানলে ইল্বল ভস্ম হয়ে যান।

এই শেষের কাহিনীতে ইল্বলের চরিত্র বড় হয়ে ওঠে নি, হয়েছে আগের কাহিনীতে। ভ্রাতার অনুরোধে তিনি ব্রাহ্মণের উপরে প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেই ভ্রাতার শোকে নিজের কর্তব্যচ্যুত হন নি। নিজের অপরাধ বুঝতে পেরে দুঃখিত হয়েছেন, আর অকাতরে দান করেছেন অতিথিদের। সে যুগের এও এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য।



পরদিনের অধিবেশনে গুরুজী একটু ভেবে বললেন: ইন্দ্রের বৃত্রাসুর বধের কথা বলেছি কি ?

তাউজী বললেন: ঋগ্বেদে বৃত্র বধের যে রূপক আছে, সে কথা বলেছেন।

গুরুজী বললেন: দেবরাজ ইন্দ্র জীবনে একটি যুদ্ধ করেছিলেন বীরের মতো, সে এই বৃত্রাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভ করেই তাঁর যশ চারি দিকে ব্যাপ্ত হয়েছে।

একটু থেমে বললেন: কিন্তু যুদ্ধে নিহত হয়েও বৃত্রাসুরের মহিমা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি।

গুরুজীর কথা শুনে আমরা আশ্চর্য হলাম। অসুরের আবার মহিমা কী! তারপরেই মনে পড়ল, মহিমা তো অসুরেরই। ছলাকলা-কৌশলের বশবর্তী তারা হয় নি, বাহু বলেই তারা ত্রিলোক ভোগ করেছে। জনসাধারণের উপর তারা অত্যাচার করে নি, ব্রাহ্মণের যজ্ঞ নষ্ট করেছে দেবতাদের যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করবার জন্য। পরবর্তী কালে যে সমস্ত দৈত্য ও রাক্ষসের কথা আমরা পুরাণে চিত্রিত দেখি, তাদের চরিত্রও বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন আছে।

গুরুজী বললেন: বৃত্রাসুরের কথা বলতে হলে আগে বিশ্বরূপের কথা বলতে হয়।

বিশ্বরূপের নাম আমরা শুনি নি। তাই আমরা বিশ্বরূপের গল্প শোনবার জন্য

সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

গুরুজী বললেন : দেবরাজ ইন্দ্র একবার গুরু বৃহস্পতিকে অপমান করেছিলেন।

তাউজী বললেন : গল্পটা বলুন।

এ তো অসুরের গল্প নয়, এ দেবতার গল্প।

তা হোক।

গুরুজী হেসে বললেন : দেবরাজ ইন্দ্র অমরাবতীর রাজসভায় সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে বসেছেন মরুৎগণ বসুগণ রুদ্রগণ আদিত্যগণ ঋভুগণ বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ। সিংহাসনের নিকটে দাঁড়িয়ে আছেন সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব ব্রহ্মবাদী মুনি বিদ্যাধর অপ্সরা কিন্নর উরগ ও পতঙ্গেরা। কেউ সেবা করছে, কেউ স্তব করছে। গন্ধর্বেরা গান গাইছে আর নৃত্য করছে অপ্সরা। সিংহাসনে ইন্দ্রের পাশে বসেছেন শচী। তাঁদের মাথায় ছাতা, দুপাশে চামর ব্যজন। ত্রিভুবনের অধিপতি ইন্দ্রের মন ঐশ্বর্যমদে উন্মত্ত।

ঠিক এই সময় দেবগুরু বৃহস্পতি রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁকে দেখতে পেয়েও দেবরাজ ইন্দ্র প্রত্যুত্থান করে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন না। কিংবা নিজের আসনে বসে থেকেও গুরুকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কিঞ্চিৎ নড়ে চড়েও বসলেন না। দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের এই ব্যবহার দেখে কোন কথা না বলে তখনই সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরক্ষণেই ইন্দ্র নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ও অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন। ক্ষমা প্রার্থনার জন্য ইন্দ্র গুরুর আশ্রমে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে সেখানে দেখতে পেলেন না। বৃহস্পতি অনুপস্থিত, শিষ্যের কাছে তিনি সহজে ধরা দিতে চাইলেন না।

সংবাদ পেয়ে অসুররা এর সুযোগ নিতে আরম্ভ করল। দেবতাদের আক্রমণ করে তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণে তাদের মস্তক উরু ও বাহু নির্ভিন্ন করতে লাগল। আর কোন উপায় না দেখে দেবতারা ব্রহ্মার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা বললেন, কী আর করা যাবে! তোমরা অন্য গুরু ধর। ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ, তোমরা তাঁর কাছেই যাও।

ব্রহ্মার কথা মতো দেবতারা গিয়ে বিশ্বরূপকেই পৌরোহিত্যে বরণ করলেন।

আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম বৃহস্পতির কাণ্ড দেখে। দেবরাজকে শাপ দেবার অমন একটা সুযোগ পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করলেন না। দুর্বাসা ইন্দ্রকে শ্রীহীন করে ছেড়েছিলেন। লক্ষ্মী হয়েছিলেন পাতালবাসিনী। বৃহস্পতি ইন্দ্রকে শাপ না দিয়ে নিজেই আত্মগোপন করে রইলেন!

গুরুজী বললেন : বিশ্বরূপ যজ্ঞ করে দেবতাদের যজ্ঞের ভাগ দিলেন। দেবতারা তাঁর পিতৃপক্ষ। আবার গোপনে অসুরদেরও হবির ভাগ দিলেন। অসুররা তাঁর মাতৃপক্ষ। ইন্দ্র এই অন্যায় দেখে বিশ্বরূপকে বধ করলেন। তাঁর হল ব্রহ্মহত্যার পাপ, আর বৃত্রাসুরের জন্মের সূচনা হল।

গুরুজী বললেন : রাজা চিত্রকেতুর কাহিনী বলতে গেলে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হবে। চিত্রকেতুর কাহিনী ভাগবতে আছে। তার শাপের কথাও আছে। কৈলাসে হরপার্বতীকে এক সঙ্গে দেখে চিত্রকেতু একটা অসম্মানজনক মন্তব্য করেছিলেন, তার জন্যেই পার্বতী তাঁকে শাপ দেন, তোমার অসুর জন্ম হোক।

এই চিত্রকেতুই বৃত্র নামে জন্মগ্রহণ করলেন ত্বষ্টার যজ্ঞে। ইন্দ্রের হাতে পুত্র বিশ্বরূপ নিহত হয়েছে শুনে ত্বষ্টা ইন্দ্রকে বিনাশের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। আহুতি দেবার সময় প্রর্থনা করলেন, হে ইন্দ্রশত্রো, তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও ও শীঘ্র শত্রু বিনাশ কর। কিন্তু দৈবক্রমে ইন্দ্রশত্রোর আদ্য শব্দটি উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হওয়ার জন্য তার অর্থ অন্য রকম হল। ত্বষ্টা বলতে চেয়েছিলেন, হে ইন্দ্রের শত্রু; কিন্তু তার মানে হল, হে ইন্দ্র, হে শত্রু। তাই যজ্ঞের আগুন থেকে বৃত্রের জন্ম হল ঠিকই, কিন্তু শত্রু বিনাশ করলেন না, করলেন ইন্দ্র। ইন্দ্রের হাতেই বৃত্রের নিধন হল।

এমন সহজে বৃত্রাসুর বধ হল দেখে আমার দুঃখ হল। বোধহয় অনেকেরই আমার মতো দুঃখ হয়েছিল। যার জন্মের এত বড ইতিহাস তার মৃত্যু এমন এক কথায় হলে কার ভাল লাগে! তাউজী আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : বৃত্রকে এমন এক কথায় মেরে ফেলবেন না।

তাউজীর কথা শুনে গুরুজী হাসলেন, বললেন : অনেকক্ষণ ধরে দুজনের যুদ্ধ হয়েছিল। অনেক কথা হয়েছিল দুজনের।

চেন্নুলু বলে উঠল : দধীচি মুনির হাড় দিয়ে বজ্র তৈরি করতে হয়েছিল।

গুরুজী বললেন : ঠিক কথা, অসুরের নাম বৃত্র কেন হল, ভাগবতে তার বর্ণনা আছে। জন্মের পরে সে প্রতি দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, রূপ তার যুগান্তকালীন কৃতান্তের মতো, বর্ণ দগ্ধ শৈল সদৃশ মলিন, অথচ তার দীপ্তি ভয়ঙ্কর। তার শিখা ও শ্মশ্রু তাম্রের মতো পিঙ্গল, চক্ষু উগ্র মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো। পদাঘাতে পৃথিবী কম্পিত করে সে নৃত্য করেছিল, আর গভীর পর্বত গুহার মতো মুখ ব্যাদান করে ঘন ঘন জৃম্ভা ত্যাগ করেছিল। তার বিস্তৃত বদন ও ভীষণ দশন দেখে মনে হয়েছিল যে সে ত্রিভুবন গ্রাসে উদ্যত হয়েছে। ভয়ে সমস্ত লোক পালিয়ে গেল।

তপস্যা দ্বারা এই সমস্ত লোককে আবৃত করে সে বৃত্র নাম প্রাপ্ত হল।

দেবতারা আর কালবিলম্ব না করে বৃত্রকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু তাঁদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বৃত্র অবলীলায় খেয়ে ফেললেন। বৃত্র বধের চেষ্টায় ব্যর্থ ও ভগ্নোদ্যম হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর শরণ নিলেন। সম্মিলিত ভাবে স্তব ও আরাধনা করে তাঁর দর্শন পেলেন। বিষ্ণু তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমাদের ভয় নেই, আমি তোমাদের মঙ্গল বিধান করব।

বিষ্ণু ইন্দ্রকে দধীচি মুনির কথা বললেন। দধীচির দেহ বিদ্যা ব্রত ও তপস্যায় দৃঢ় হয়েছে, তোমরা সেই দেহটি ভিক্ষা কর। তোমাকে না দিলেও ঋষি তাঁর শিষ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে নিশ্চয়ই দেহটি দান করবেন। বিশ্বকর্মা তাঁর দেহের অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করে দিলে সেই বজ্র দিয়ে তুমি বৃত্র বধে সক্ষম হবে।

গুরুজী বললেন : অশ্বিনীকুমারের কথায় আর একটি প্রসঙ্গ এসে পড়ে। একবার এঁরা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য দধীচি মুনির নিকটে গিয়েছিলেন। দধীচি তাঁদের বলেছিলেন, এখন আমি কর্মে নিবিষ্ট আছি, তোমরা কিছু পরে এস।

কিন্তু অশ্বিনীকুমারেরা দ্বিতীয়বার আসবার আগেই ইন্দ্র এসে ঋষিকে ভয় দেখালেন। বললেন, সাবধান, ওরা জাতে বৈদ্য, ওদের ব্রহ্মবিদ্যা শেখালে আমি আপনার শিরশ্ছেদ করব।

ঋষি ভয় পেয়ে গেলেন। অশ্বিনীকুমাররা এলে বললেন, তোমাদের আর ব্রহ্মবিদ্যা শেখাবার উপায় নেই। ইন্দ্র যা বলে গেছেন, সে কথাও তাঁদের বললেন।

অশ্বিনীকুমাররা বললেন, এই কথা! আমরা এর বিহিত করছি।

বলে দধীচির মুণ্ড কেটে অশ্বের মুণ্ড জুড়ে দিলেন। ঋষি সেই ঘোড়ার মুখ দিয়ে তাদের ব্রহ্মবিদ্যা শেখালেন।

সংবাদ পেয়ে ইন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন। রাগে অন্ধ হয়ে ঋষির শিরশ্ছেদ করে চলে গেলেন। অশ্বিনীকুমাররাও অপেক্ষা করছিলেন। ইন্দ্র চলে যেতেই তাঁরা ঋষির নিজের মুণ্ড এনে দেহে জুড়ে দিলেন।

দধীচির সঙ্গে ইন্দ্র আরও অনেকবার শত্রুতা করেছিলেন। দধীচি যখন উগ্র তপস্যায় নিরত, তখন ভয় পেয়ে ইন্দ্র অলম্বুষা নামে একজন অপ্সরাকে তাঁর তপোভঙ্গের জন্য পাঠিয়েছিলেন। শুধু তপোভঙ্গ নয়, বিব্রত হয়েছিলেন ঋষি। ইন্দ্রের প্রতি তাঁর বিরাগ জন্মেছিল।

কিন্তু দেবতারা যখন তাঁর দেহ ভিক্ষা করতে এলেন, তখন ঋষি ভুলে গেলেন সব বিরাগের কথা। বললেন, যদি আমার নশ্বর দেহ কারও উপকারে আসে, তবে আমি এই ত্যাগের সুযোগ কেন হেলায় হারাব!

ঋষির কথা শুনে দেবতারা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, মুখে তাঁদের কোন উত্তর যোগাল না। যোগ অবলম্বন করে ঋষি তাঁর দেহ রক্ষা করলেন।

তারপর সেই দেহের অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র তৈরি করে দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই বজ্র হাতে নিয়ে বৃত্রাসুরকে আক্রমণ করলেন। এক দিকে ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারা, অন্য দিকে বৃত্রাসুরের সঙ্গে দৈত্য দানব ও রাক্ষস। যুদ্ধ আরম্ভ হল নর্মদার তীরে। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে সত্য যুগ শেষ হয়ে তখন ত্রেতা আরম্ভ হয়েছে।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন : কোন্ কোন্ দানব এই যুদ্ধে নেমেছিল ?

গুরুজী বললেন : নমুচি শম্বর বিপ্রচিত্তি বৃষপর্বা প্রভৃতি সমস্ত দানবেরই নাম পাওয়া যায়। তাদের সঙ্গে সুমালি মালি প্রভৃতি রাক্ষসরাও নেমেছিলেন। তাঁদের অস্ত্রেরও নানা নাম—গদা পরিখ প্রাস শূল তোমর মুদ্গর খড়্গ বাণ পরশ্বধ শতঘ্নী ভুষুণ্ডি প্রভৃতি। কিন্তু এত সব অস্ত্রেও দেবতারা কাবু হলেন না। আকাশে অদৃশ্য থেকে তাঁরা যুদ্ধ করতে লাগলেন।

অসুরদের অস্ত্রশস্ত্র যখন ফুরিয়ে গেল তখন তাঁরা বৃক্ষ উপল ও গিরিশৃঙ্গ পর্যন্ত প্রক্ষেপ করতে লাগলেন। তাতেও কোন ফল হল না। দেখে তাঁরা ভীত হলেন। এবং যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে পালাতে লাগলেন। বড় বড় বীর দৈত্যদের পালাতে দেখে বৃত্রাসুর হাসলেন। তাদের নাম ধরে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, জন্মালে তো মৃত্যু হবেই, তার জন্য মৃত্যুকে এত ভয় কেন! যে মৃত্যুতে ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গ সেই মৃত্যুই তো বুদ্ধিমানের কাম্য। ধর্মশাস্ত্রেও আছে যে যোগযুক্ত পরিব্রাজক ও সম্মুখ যুদ্ধে নিহত যোদ্ধা উভয়েই উর্ধ্বলোকগামী।

কিন্তু দৈত্যরা আর দাঁড়ালেন না। দেবতারা তাঁদের পিছন থেকে তাড়া করে নিয়ে যেতে লাগলেন। তাই দেখে বৃত্র দেবতাদের বললেন, পিছনে তাড়া করে শত্রু বধ করলে আপনাদের কৃতিত্ব বাড়বে না। তার চেয়ে আমার সঙ্গে লড়তে আসুন।

বলে বৃত্র এক হুঙ্কার ছাড়লেন। আর সেই হুঙ্কারের শব্দে দেবতারা দূরে ছিটকে পড়লেন। অনেকে তো বজ্রাহতের মতো মূর্ছা গেলেন। বৃত্র তাঁর দু পায়ে দেবসেনাদের মর্দিত করতে লাগলেন।

তার পরে ইন্দ্র ও বৃত্র হলেন মুখোমুখি। বৃত্র ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হতেই ইন্দ্র তাঁর দিকে গদা নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু বৃত্র সেই গদা বাম হাতে অবলীলাক্রমে ধরে ফেললেন। এবং ঐরাবতের কুম্ভে ঐ গদা দিয়ে একটি আঘাত

করলেন। বৃত্রাসুরের এই বিক্রম দেখে শত্রুপক্ষের সকলেই প্রথমে প্রশংসা করেছিলেন ; কিন্তু যখন দেখলেন যে ঐরাবত ইন্দ্রকে নিয়ে রক্তবমন করতে করতে রণস্থল থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়লেন, তখন তাঁরা হায় হায় করে উঠলেন। ইন্দ্রের এই দুরবস্থা দেখে বৃত্রাসুর আর তাঁকে আঘাত করলেন না। কিন্তু ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করছেন না দেখে সহাস্যে বললেন, তুমি শুধু ব্রহ্মঘাতক নও, তুমি নিজের গুরুকে হত্যা করেছ। তোমার নিষ্পাপ গুরু যখন তোমারই জন্য যজ্ঞ করছেন, তখন তুমি খড়্গ দিয়ে যজ্ঞের পশুর মতো তাঁর মুণ্ডপাত করেছ। ত্রিলোকে তোমার চেয়ে অসৎ আর কেউ নেই। দয়া লজ্জা শ্রী ও কীর্তি তোমাকে পরিত্যাগ করেছে, তোমার কর্ম দোষে তুমি রাক্ষসদেরও নিন্দার পাত্র হয়েছ। আমি এই শূল দিয়ে তোমার হৃদয় নির্ভিন্ন করলে অগ্নি তোমার পাপ দেহ স্পর্শ করবেন না, গৃধ্রেরা তোমাকে ভক্ষণ করবে। আর—

গুরুজী এক মুহূর্ত থামলেন। তরেপর বললেন : শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়টি সকলের একবার পড়া উচিত। বজ্রধারী ইন্দ্র সহ যুধ্যমান বৃত্রাসুরের ভক্তি জ্ঞান ও বিক্রম সংক্রান্ত বিচিত্র কথা। এই একটি পরিচ্ছেদেই বৃত্রের চরিত্রটি অদ্ভুত ভাবে ফুটে উঠেছে।

গুরুজী আরও কিছুক্ষণ থামলেন, তারপর বললেন : মহাভারতের কর্ণ যে অবস্থায় নিহত হয়েছেন, ইন্দ্রের তখন সেই অবস্থা। তবু বৃত্র তাঁকে আঘাত না করে বললেন, হে ইন্দ্র, আমি তোমার শত্রু, তোমার সামনে উপস্থিত আছি, বজ্র দিয়ে আমাকে কেন আঘাত করছ না! তবে তোমার বজ্র অমোঘ এমন মনে কোরো না। কৃপণের কাছে যাচ্ঞা যেমন নিষ্ফল, তোমার বজ্রও তেমনি আমার কাছে নিষ্ফল হতে পারে। দধ্যঞ্চ ঋষির তপস্যায় ও বিষ্ণুর তেজে তীক্ষ্ণ ঐ অস্ত্র নিক্ষেপ করে আমাকে বধ করবার চেষ্টা কর। বিষ্ণু তোমাকে পাঠিয়েছেন, পরাজয়ের আশঙ্কা তুমি করো না। তোমার বজ্রে আমার অপকার হবে না, ভোগের নাগপাশ আমার ছিন্ন হবে। প্রভুর চরণে চিত্ত সমাহিত করে দেহত্যাগ করলে আমি যোগীর গতি প্রাপ্ত হব।

বৃত্র এই কথা বলে থামলেন না, আরও উপদেশ দিলেন ইন্দ্রকে। বললেন, আমি ভগবানের ভৃত্য। কাজেই তিনি আমাকে স্বর্গ মর্ত্য পাতালের কোন সম্পত্তি দান করবেন, এ কথা আমি মনে করি না। পার্থিব সম্পত্তিই সকল অনর্থের মূলে। কাজেই আমি আশা করি যে ভগবান তাঁর ভক্তজনের ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ বিষয়ক আয়াসের উপশম করবেন।

তারপর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলেন। হে ভগবান, তোমার পাদপদ্ম

যাদের আশ্রয়, আমি সেই সব দাসের অনুদাস। আমি স্বর্গ মর্ত্যের আধিপত্য চাই না। যোগসিদ্ধি মুক্তিতেও আমার প্রয়োজন নেই। তোমার ভক্তজনের সঙ্গে আমার সখ্য হোক, এই আমার প্রার্থনা।

তারপরেই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন, ওরে পাপ, এবারে তুই হত হলি। বলে প্রলয়াগ্নির মতো ভয়ঙ্কর শূল ইন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু ইন্দ্র এই শূল দেখে ভয় পেলেন না, বজ্র দিয়ে শূল কেটে ফেললেন, আর তারই সঙ্গে বৃত্রের একটি হাত কেটে গেল। বৃত্র তাতে একটুও দমলেন না। অন্য হাতে পরিখ ধারণ করে ইন্দ্রের নিকটে এসে তাঁকে আঘাত করলেন। ঐ আঘাতে ঐরাবত তাড়িত হল এবং বজ্র খসে পড়ল ইন্দ্রের হাত থেকে।

অন্তরীক্ষে থেকে যাঁরা এই যুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁরা বৃত্রাসুরের এই শক্তি দেখে ধন্য ধন্য করেছিলেন। তারপরে ইন্দ্রের অবস্থা দেখে হাহাকার করে উঠলেন। লজ্জায় ইন্দ্র অধোবদন হয়ে ছিলেন। বৃত্রাসুর তাঁকে বললেন, হে দেবরাজ, লজ্জা বা বিষাদের সময় এ নয়, তোমার বজ্র তুলে নিয়ে শত্রুকে বধ কর। আমার কাছে পরাজিত হয়েছ বলে ভেবো না যে তোমার জয়ের আশা আর নেই। তুমি আমি কেউ নই, ভগবানই সমস্ত সাহস বল প্রাণ অমৃত ও মৃত্যুর স্বরূপ। আমাদের হর্ষবিষাদশূন্য হয়ে যুদ্ধ করা উচিত। এই সমর দ্যূত স্বরূপ, কার জয় হবে আমরা কেহই জানি না।

বৃত্রের কথা নিষ্কপট জেনে ইন্দ্র তাঁর বজ্র তুলে নিলেন, বললেন, হে বৃত্র, বৈষ্ণবীমায়া উত্তীর্ণ হয়ে তুমি সিদ্ধ হয়েছ দেখছি। তুমি অসুর নও, তুমি মহাপুরুষ। তোমার ভগবানে ভক্তি দেখে বুঝতে পারছি যে স্বর্গ রাজ্যে তোমার লোভ নেই।

তারপরে আবার দুজনে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হল। বৃত্রের দক্ষিণ হাত আগেই ছিন্ন হয়েছিল, বাম হাতে পরিখ নিয়ে আবার তিনি ইন্দ্রকে আঘাত করলেন। ইন্দ্র সেই পরিখ ও বাহুটিও বজ্র দিয়ে ছেদন করলেন। বৃত্র এইবারে তাঁর বিরাট দেহ দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে ঐরাবত সহ ইন্দ্রকে গ্রাস করে ফেললেন। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে দেবতারা হায় হায় করে উঠলেন।

আমরাও এই কাহিনী শুনে আশ্চর্য হলাম। বজ্র দিয়ে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছিলেন। এই কথাই আমাদের জানা। কিন্তু বৃত্র ইন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলল, এ কথা আমাদের জানা ছিল না। তার পরের ঘটনা শোনবার জন্য আমরা কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

শুকজী আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন: বৃত্রাসুরের পেটের

ভিতর ইন্দ্রের মৃত্যু হল না। নারায়ণ কবচের প্রভাবে তিনি বেঁচে রইলেন। এই নারায়ণ কবচের ইতিবৃত্ত জান ?

বলে তাউজীর মুখের দিকে তাকালেন।

তাউজী বললেন : না।

গুরুজী বললেন : নারায়ণ কবচ একটি ধর্ম, বিষ্ণুর কাছে পেয়েছিলেন দধীচি মুনি। দধীচি দিয়েছিলেন ত্বষ্টাকে, ত্বষ্টার কাছ থেকে পেয়েছিলেন বিশ্বরূপ। দেবতাদের গুরুর পদে বৃত হয়ে বিশ্বরূপ এই কবচ দেবরাজকে দিয়েছিলেন। এই কবচের প্রভাবে ও মায়ার বলে ইন্দ্র বৃত্রাসুরের কুক্ষি বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলেন এবং বজ্র দিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করলেন।

বৃত্রাসুর নিহত হল। গন্ধর্বরা দুন্দুভি বাজাল আকাশে। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ বৃত্রহন্তার স্তব পাঠ করে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। বৃত্রের মৃতদেহ থেকে আত্মজ্যোতি নিষ্ক্রান্ত হয়ে দেবতাদের সামনেই ভগবানে বিলীন হল।

গুরুজী একটু থেমে বললেন : ঋগ্বেদের বৃত্রর কথা আমরা পূর্বে বলেছিলাম। এ হল পৌরাণিক বৃত্রের কথা। দেবরাজ ইন্দ্র মহাপরাক্রান্ত অসুরদের মধ্যে এই একজনকেই নিজ হাতে বধ করেছেন। এর জন্যেও তাঁকে বিষ্ণুর কাছে যেতে হয়েছিল। বিষ্ণু তাঁকে অভয় দিয়ে শক্তি দিয়েছিলেন, দধীচির নিকট তাঁর অস্থি প্রার্থনা করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। দেবরাজের প্রয়োজনে একজন ঋষিকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু কেন এই প্রয়োজন হয়েছিল, পুরাণে তার কৈফিয়ৎ নেই।

এই কথাটি আমাব মনেও এসেছিল। বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে যে সব কথা বলেছিলেন, তাতেই বোঝা গেছে যে তিনি একজন ভক্ত ছিলেন, ভগবানে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি জানতেন যে ইন্দ্র অমর হয়েছেন অমৃত পান করে, যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হবে না। বারে বারে পরাজিত করেছেন ইন্দ্রকে, লজ্জা দিয়েছেন, ধিক্কার দিয়েছেন তাঁর গুরু হত্যার পাপের জন্য; আবার সেই সঙ্গে যুদ্ধে তাঁকে উৎসাহিত করেছেন। যেন এই যুদ্ধে ইন্দ্রের হাতে প্রাণ দেওয়ার তাঁর প্রয়োজন ছিল। তাঁর যুদ্ধের নীতি ও বিক্রম, তাঁর ধর্মজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি সত্যিই প্রশংসার্হ।

কিন্তু একটি কথা আমার কাছে হেঁয়ালি ছিল। সে কথা গুরুজী বলেন নি। বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন সমস্ত দানব ও রাক্ষসেরা। প্রধান প্রধান দানব ও রাক্ষসদের নাম শুনেছি। বৃত্র কি তাঁদের অধিপতি ছিলেন, না বৃত্রকে সাহায্য করতে এসেছিলেন তাঁরা, এবং বেগতিক বুঝে পালিয়ে গিয়েছিলেন! কিন্তু গুরুজীকে আমি এ প্রশ্ন করবার সাহস পেলাম না।

বৃত্রাসুরের পর আরও কয়েক জন অসুরের কথা গুরুজী আমাদের সংক্ষেপে

বললেন। তারকাসুর ত্রিপুরাসুর ও গয়াসুর। বৃত্রাসুরের মতো এঁদের উপাখ্যানও পুরাণে অমর হয়ে আছে।

গুরুজী বললেন : ত্রিপুরাসুর একজন অসুর নয়। তারকাসুরের তিন পুত্র তাঁরা। তাঁদের নাম তারকাক্ষ কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী। তিনটি পৃথক পুরে তাঁরা বাস করতেন। মহাদেব তাঁদের ত্রিপুর ধ্বংস করে ত্রিপুরারি হয়েছিলেন।

তাউজী বললেন : তারকাসুর থেকেই শুরু করুন।

গুরুজী শিবপুরাণ থেকে তারকাসুরের কথা বললেন।

এই অসুর দেবতাদের জয় করবার জন্য সহস্র বৎসর তপস্যা করে ব্যর্থ হলেন। কিন্তু তবু তিনি নিরস্ত্র হলেন না। শেষে তাঁর মাথা থেকে এক রকম তেজ নির্গত হয়ে দেবতাদেব দগ্ধ করতে লাগল। তাই দেখে দেবতারাই ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁকে বর দিতে বললেন। তারকাসুরের কাছে এসে ব্রহ্মা বললেন, বর নাও।

তারকাসুর বললেন, অমরত্বের বর তো আপনি দেবেন না, তার বদলে দুটি বর আমাকে দিন। প্রথম বর এই যে আমার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ জন্মাবে না, আর দ্বিতীয় বর এই যে মহাদেবের পুত্র ছাড়া আর কারও হাতে আমার মৃত্যু হবে না।

ব্রহ্মা বললেন, তথাস্তু।

তারকাসুর ভাবলেন যে এ তাঁর অমর হবারই সমান হল। মহাদেব এখন বিপত্নীক, গভীর তপস্যায় নিমগ্ন। তাঁর পুত্রও হবে না, আর তাঁকে কেউ বধ করতেও পারবে না। ত্রিলোকে সব চেয়ে শক্তিশালী হয়েছেন তিনি, কাজেই তাঁর পরাজয়ও অসম্ভব। তারকাসুর স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের উপরে অত্যাচার শুরু করলেন।

দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, অসম্ভব, কেউ কিছু করতে পারবে না। শিবকে সংসারী করবার চেষ্টা কর।

উপায়ান্তর না দেখে দেবতারা সেই চেষ্টা আরম্ভ করলেন। মদনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন হিমালয়ে, মহাদেব যেখানে যোগে নিমগ্ন। আর পার্বতী তাঁরই জন্য তপস্যা করছেন। মদন তাঁর পঞ্চশর নিক্ষেপ করে দগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু পার্বতী শিবকে পেলেন তপস্যায়।

কার্তিকেয়র জন্ম হল। তিনি শিবের পুত্র, কিন্তু পার্বতীর গর্ভে তাঁর জন্ম নয়। মাঝখানে অগ্নি আর গঙ্গা আছেন, আর আছে শরবন ও ছজন কৃত্তিকা। রহস্যময় পরিবেশে ষডানন কার্তিকেয়র জন্ম হল।

দেবতারা কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি করলেন। তাঁরই হাতে তারকাসুর নিহত হল।

তারকাসুরের পরে তাঁর তিন পুত্র তারকাক্ষ কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী ঘোরতর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করলেন। ব্রহ্মা বর দিতে চাইলে তাঁরা অমর হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ব্রহ্মা বললেন, তা হবার নয়, তোমরা অন্য বর নাও।

তখন তাঁরা অনেক পরামর্শ করে বললেন, আমরা এমন তিনটি পুরে বাস করতে চাই যেখানে সমস্ত অভীষ্ট বস্তু থাকবে, কিন্তু সেই পুর কেউ কোন রকমে ধ্বংস করতে পারবে না। সহস্র বৎসর পরে আমরা এক সঙ্গে মিলিত হব, আর আমাদের ত্রিপুর এক হয়ে যাবে। তখন যদি কেউ এক বাণে এই ত্রিপুর ভেদ করতে পারেন, তাহলেই আমাদের মৃত্যু হবে।

ব্রহ্মা বললেন, তথাস্তু।

তারকপুত্রেরা তখন ময়দানবকে দিলেন ত্রিপুর নির্মাণের ভার। যথাসময়ে তিনটি পুর নির্মিত হল। স্বর্গে তারকাক্ষের স্বর্ণময়পুর, অন্তরীক্ষে কমলাক্ষের রৌপ্যময়পুর, আর বিদ্যুন্মালীর লৌহময়পুর পৃথিবীতে নির্মিত হল। শত যোজন বিস্তৃত এই সব পুরের মধ্যে দৈত্যেরা এসে আশ্রয় নিল।

তারকাক্ষের হরি নামে এক পুত্র ব্রহ্মার কাছে বর পেয়ে তিন পুরেই এক একটি মৃতসঞ্জীবনী পুষ্করিণী নির্মাণ করেছিল। দৈত্যদের সেই পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করলেই তারা জীবিত হয়ে উঠত। কাজেই এই অসুরেরা সর্বত্র অত্যাচার করে বেড়াতে লাগল। ইন্দ্র বজ্রাঘাত করে ত্রিপুরের কোন ক্ষতি করতে পারলেন না। তখন দেবতারা গেলেন ব্রহ্মার নিকটে। ব্রহ্মা বললেন, চল মহাদেবের কাছে।

সবাই মিলে মহাদেবকে অনুরোধ করলেন। মহাদেব বললেন, দানবরা প্রবল, আমি একাকী তাদের বধ করতে পারব না। আমার অর্ধেক তেজ নিয়ে তোমরা চল।

দেবতারা বললেন, দানবরা আমাদের দ্বিগুণ বলশালী। আমরা আপনাকে আমাদের অর্ধেক বল দিচ্ছি, আপনিই তাদের বিনাশ করুন।

তারপর যুদ্ধের জন্য বিরাট প্রস্তুতি আরম্ভ করল। মহাভারতের কর্ণ পর্বে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। বিশ্বকর্মা মহাদেবের রথ নির্মাণ করলেন। রথের বিভিন্ন অংশ হল গ্রহনক্ষত্র পৃথিবী নদী পর্বত ইত্যাদি, চন্দ্র সূর্য রথ চক্র ও ইন্দ্রাদি লোকপালরা অশ্ব হলেন। ব্রহ্মা হলেন সারথি। ত্রিপুর লক্ষ্য করে মহাদেব যে বাণ নিক্ষেপ করলেন তাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন বিষ্ণু অগ্নি ও চন্দ্র। সেই বাণের আঘাতে আকাশে ত্রিপুর দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হল।

বুঝতে পারলুম যে গুরুজী এই যুদ্ধের কথা অত্যন্ত সংক্ষেপে বললেন। তারপরে বললেন গয়াসুরের গল্প। এই গল্প আছে বায়ুপুরাণে।

গয় নামে এক মহাবলশালী অসুর ছিল, তাঁর দেহ ষাট যোজন স্থূল ও উচ্চতায় একশো পঁচিশ যোজন। এমন বিরাট দেহ হলেও গয়াসুর অত্যাচারী ছিলেন না, বরং ধার্মিক বিষ্ণুভক্ত বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। বিনয়ী নম্র স্বভাবের এই অসুর কোলাহল পর্বতে গিয়ে তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। তাঁর কঠিন তপস্যা দেখে দেবতারা ভয় পেয়ে গেলেন। গয়াসুর তপস্যা করছে কেন তা জানা যাচ্ছে না। তাই সবাই গেলেন ব্রহ্মার কাছে, ব্রহ্মাকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেবতাদের বিরাট সভা বসল। সেই সভায় স্থির হল যে গয়াসুরকে এখনই বর দিয়ে দেওয়া উচিত।

এ কথা স্থির হতেই সবাই কোলাহল পর্বতে গেলেন গয়াসুরের কাছে। বললেন, বৎস, বর নাও।

গয়াসুর বললেন, পার্থিব কোন দ্রব্যে আমার লোভ নেই, আমি চাই যে আমার দেহ দেবতা মন্ত্র বা তীর্থের চেয়েও পবিত্র হোক।

দেবতারা ভাবলেন, এ আবার এমন কী বর! বললেন, তথাস্তু।

গয়াসুর কিন্তু মহা খুশী। পাহাড় থেকে নেমে এসে নগর ভ্রমণে বেরোলেন। তাঁকে দেখে সমস্ত প্রাণী স্বর্গে চলে গেল। গয়াসুর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এক নগর থেকে অন্য নগরে যেতে লাগলেন, আর সবাই যেতে লাগল স্বর্গে। যমপুরী শূন্য হয়ে গেল, আর স্বর্গ হল লোকে লোকারণ্য। দেবতারা দেখলেন, এ মহা বিপদ। কাজেই আবার দেবতাদের সভা বসল। বিষ্ণু বললেন, গয়াসুরের দেহটি যজ্ঞের জন্য চেয়ে নেওয়া যাক।

তাই করা হল। গয়াসুর তখনই তাঁর দেহটি যজ্ঞের জন্য দান করলেন। যম তাঁর ধর্মশিলা গয়াসুরের দেহের উপরে স্থাপন করলেন। আর দেবতারা সবাই উঠলেন সেই শিলার উপরে। কিন্তু গয়াসুরের দেহ নিশ্চল হল না। তখন বিষ্ণু সেই শিলার উপরে উঠে দাঁড়ালেন।

গয়াসুর এইবারে দেবতাদের মতলব বুঝতে পেরে বললেন, আপনারা এত কষ্ট কেন করলেন, আমাকে একটিবার বললেই আমি নিশ্চল হতাম।

সত্যিই তো, গয়াসুর কখনও দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। নিশ্চল হতে বললে নিশ্চয়ই নিশ্চল হতেন। লজ্জা পেয়ে দেবতারা বললেন, তুমি বর নাও।

গয়াসুর বললেন, তবে এই বর দিন যে যতদিন এই পৃথিবী থাকবে আর আকাশে উঠবে চন্দ্র সূর্য, তত দিন আপনারা এই শিলায় অবস্থান করবেন, আর এই স্থান একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হবে।

দেবতারা এবারেও বললেন, তথাস্তু।

গল্প শেষ করে গুরুজী একটি মন্তব্য করলেন : এই হল গয়ামাহাত্ম্যের কথা, কিন্তু এ কথা খুব প্রাচীন নয়, প্রাচীন হলে মহাভারতে এই গল্পের উল্লেখ থাকত।

আমি তখন অন্য কথা ভাবছিলাম। পৃথিবীর সকল প্রাণীর মুক্তির চেষ্টা যে করে, সে কেমন অসুর! কোন দেবতা তো এ রকমের আদর্শ স্থাপন করেন নি! গয়াসুরের মতো অসুর আরও ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু গুরুজী আর নতুন গল্প বললেন না। বাহিরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বললেন : আজ এই পর্যন্তই থাক।



ভোরবেলায় বাগানের কাজ করা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তার মধ্যে আর কোন বৈচিত্র্যের আস্বাদ খুঁজে পাই নে। লেখাপড়ার কাজেও তাই। রাতে উপাসনার মন্দিরে গুরুজীর মুখে যা শুনলাম, দিনের বেলায় তা লিখে রাখতেই হবে। না লিখে রাখলেই বিপদ। সব কথা মনে থাকবে না, মনে রাখা সম্ভব নয়। একবার পিছিয়ে পড়লে আর কখনও এক সঙ্গে পা ফেলে এগোনো যাবে না। সে চেষ্টা করলে মাঝখানে ফাঁক থেকে যাবে।

এখন আমাদের ছুটি শুধু বিকেলবেলায়। সারা দুপুর লেখা পড়া করবার পর যখন ক্লান্তি আসে, তখন মনে পড়ে ভাগীরথী গঙ্গার কথা আর গহন গম্ভীর হিমালয়ের কথা। ইচ্ছা হয়, গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি, হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে সারা দিনের চিন্তা ভাবনাকে খানিকক্ষণের জন্য মুক্তি দিই। এই গঙ্গা আর এই হিমালয় ভারতের প্রাণকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য আজও এই অঞ্চলে সগৌরবে স্পন্দিত হচ্ছে।

খাতাপত্র গুটিয়ে রেখে আমি ঘরের বাহিরে বেরোচ্ছিলাম। স্বপ্তি এসে বারান্দায় বাধা দিল। বলল : খবরদার, তুমি একা বেরোবে না।

আমি এই বাধার জন্য তৈরি ছিলাম না। তাই আশ্চর্য হয়ে বললাম : কেন, তুমি আমার সঙ্গে বেরোবে নাকি?

স্বপ্তি সকৌতুকে বলল : আপত্তি আছে বুঝি?

হেসে বললাম : আপত্তি আমার নয়, চেন্নুলুর।

স্বপ্তি একটা কটাক্ষ করে চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম : কে বারণ করেছে বল তো!

আমি ভেবেছিলাম যে স্বপ্তি শকুন্তলাদির নাম করবে। কিন্তু তা করল না। বলল : মাস্টারজী তোমার ওপর খুব রেগে গেছেন।

মাস্টারজী মানে পাধ্যে। কয়েক দিন আমাদের সংস্কৃত পড়িয়ে এই নাম পেয়েছেন। বললাম : তিনি আবার রেগে গেলেন কেন?

স্বপ্তি বলল : রাগবার কথাই তো। এখানে পড়াশুনো করতে এসেছ, না—

বলেই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, বাকি কথাটা আর সম্পূর্ণ করল না। আমি চারি দিকে চেয়ে দেখলাম। তারপরেই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। ও ধারের ঘর থেকে মিসেস খুরানা বেরিয়েছেন সেজেগুজে। স্বপ্তি তাঁকেই দেখতে পেয়ে পালিয়ে গেল।

আমার কর্তব্য আমি স্থির করতে পারলাম না। এখন এগোলেই মিসেস খুরানা আমাকে ধরে ফেলবেন, তারপর আমার সঙ্গেই বেড়াতে বেরোবেন। কেন জানি না, তাঁর সঙ্গে বেড়াবার ইচ্ছা আমার হল না। আমি আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়বার জন্য পা বাড়ালাম।

মিসেস খুরানা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে এসেছিলেন। বললেন : ওকি, আবার ঘরে ঢুকছেন কেন, চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।

সহসা আমি কোন আপত্তি জানাতে পারলাম না। খানিকটা ইতস্তত করবার পর স্বপ্তির কথা মনে পড়ল। বললাম : আজ আমাকে মাস্টারজীর সঙ্গে বেরোতে হবে।

মিসেস খুরানা একটা ধমক দিয়ে বললেন : রাখুন আপনার মাস্টারজীকে, চলে আসুন আমার সঙ্গে।

আমি আর আপত্তি করতে পারলাম না। বাধ্য ছেলের মতো মিসেস খুরানাকে অনুসরণ করে আশ্রমের বাহিরে বেরিয়ে এলাম।

গঙ্গার ধারে পৌঁছে মিসেস খুরানা বললেন : এখানে নয়, আজ আমরা দূরে গিয়ে বসব। এখানে বসলেই সেই মেয়েটা জ্বালাতে আসবে।

বলে হনহন করে এগিয়ে চললেন।

আমি জানি, আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতেই হবে। মিসেস খুরানা আমাকে কিছুতেই অব্যাহতি দেবেন না। এখানে থামলে অনর্থক বচসা হবে। স্বপ্তি ঠিকই বলেছিল, পাধ্যের সঙ্গে বেরোলেই আমার ভাল হত। পছন্দ মতো কথা বলা যেত তাঁর সঙ্গে। মিসেস খুরানার পাশে পাশে আমি নিঃশব্দে অগ্রসর হলাম।

মিসেস খুরানা বেশিক্ষণ নীরবে রইলেন না, বললেন : আপনি ভারি লাজুক,

সহজ ভাবে কথাই বলতে পারেন না দেখছি।

এ কথার কোন উত্তর নেই।

মিসেস খুরানা বললেন : আশ্রমের নাম শুনে আমি ভেবেছিলাম যে কয়েকটা দিন বেশ আনন্দে কাটবে। ওমা, এখন দেখছি, এ একেবারে সন্তবাবাজীর আশ্রম। সবাই এখানে বাবাজী সেজে বসে আছেন।

এবারে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আশ্রম আবার অন্য রকম হয় নাকি!

মিসেস খুরানা বললেন : এত মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে থেকেও অন্য রকম হবে না!

বলে নিজের সাজ-সজ্জার দিকে একবার তাকালেন। তারপর বললেন : নাচ গান পার্টি-পিকনিক এ সবে কি আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট হয়!

আপনি নাচ গান ভালবাসেন বুঝি!

নাচ গান তো ভালবাসারই জিনিস। বুড়ো যদি তুপুর বেলায় পড়াত, তাহলে সন্ধ্যে বেলাটা উপভোগ করা যেত। আপনি নাচতে জানেন তো!

আমি!

হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। এখানে আর অন্য কে আছে!

আমি লজ্জিত ভাবে বললাম : না।

না!

আমি সসঙ্কোচে বললাম : আমাদের দেশের পুরুষ মানুষ নাচে না।

মিসেস খুরানা আশ্চর্য হয়ে বললেন : বলেন কি! কোন্ দেশের লোক আপনি?

বাঙলার।

দিল্লীতে আমি অনেক বাঙালীকে চিনি, তারা সবাই নাচে। নাচ না জানলে সোসাইটিতে মিশবেন কী করে!

তারপরেই আশ্বাস দিয়ে বললেন : দিল্লীতে এলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, আমি আপনার নাচ শেখার ব্যবস্থা করে দেব।

আমি এবারে সাহস করে বললাম : পুরুষ মানুষের নাচের কথা ভাবলে আমার হাসি পায়। শ্মশানে ভূত প্রেতরা নাচে, আর মহাদেব মাঝে মাঝে নাচেন বলে অনেকেই তাঁকে পাগল ভাবে।

মিসেস খুরানা বললেন : মহাদেব কে?

আমি সংক্ষেপে বললাম : শিব।

মিসেস খুরানা একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললেন : হরিবল্। আপনারাও পাগল হয়ে গেছেন দেখছি।

তাঁরপরে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখতে পেয়ে বললেন : আসুন, এইখানে আমরা বসি।

এবারেও আমরা গঙ্গার ধারে বসলাম, কিন্তু আশ্রমের নিকটে নয়। অনেকটা দূরে এসে একটা ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় পাথরের উপরে এসে বসলাম। সামনে একই গঙ্গা, একই হিমালয়, একই আকাশ। কিন্তু তবু এই পরিবেশ নূতন মনে হল।

মিসেস খুরানা নীরবে থাকতে ভালবাসেন না, বললেন : এই আশ্রমে আমার আর একটুও ভাল লাগছে না। ইচ্ছা করছে এখান থেকে পালিয়ে যাই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ভাল লাগছে না কেন ?

মিসেস খুরানা বললেন : কী করে লাগবে ! যেমন থাকার ব্যবস্থা, তেমনি খাবার। শাকপাতা খেয়ে আর দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে কি দিনের পর দিন কাটানো যায় ! এমন জানলে প্রকাশ আমাকে কিছুতেই এখানে পাঠাত না।

প্রকাশ কে ?

প্রকাশ খুরানা আমার স্বামী। তিন মাসের জন্যে বিলেত গেছে। দু' একটা আশ্রমের ব্যবস্থা দেখে ওর ভাল লেগেছিল, আমারও যে শখ ছিল না তা নয়। ভেবেছিলাম, এই তিনটে মাস নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব। এখন দেখছি, ওমা—

আমি কোন প্রশ্ন না করে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

মিসেস খুরানা বললেন : এ যেন মরা মানুষের আশ্রম। কারও মধ্যে প্রাণের সাড়া দেখছি না। সত্যিই, আপনারা কি বাঁচতে জানেন না ?

তারপরেই প্রস্তাব করলেন : চলুন, কাল সকালে আমরা এখানকার বনজঙ্গল ছেড়ে হরিদ্বার শহরে যাই। তারপর—

তারপর ?

তারপর দেরাদুন মসুরি। দু চার দিন একটা ভাল হোটেলে থাকলেই জীবনটা অন্য রকম মনে হবে।

তা হবে। কিন্তু সেজন্য তো আমরা এখানে আসি নি, আমরা এসেছি ভারতের আত্মাকে আবিষ্কার করতে। সে কাজে সফল হলেই আমাদের জীবন সার্থক হবে।

মিসেস খুরানা সরোষে বলে উঠলেন : নিজের আত্মাকে আগে আবিষ্কার করুন।

আমি এ কথার কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় অনেক দূরে একজন মানুষকে দেখতে পেলাম। হাতে একখানা লাঠি নিয়ে গঙ্গার ধারে ধারে হনহন করে এগিয়ে আসছেন। মিসেস খুরানাও তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন,

বিরক্ত ভাবে বললেন : দেখছেন লোকটাকে, ধাওয়া করে কত দূর এসেছে!

আরও খানিকটা এগিয়ে আসবার পর মানুষটিকে আমি চিনতে পারলাম। পাধ্যে বেড়াতে বেরিয়েছেন। ভদ্রলোক পরিশ্রম করতে ভালবাসেন। প্রতি দিন বিকেলবেলায় অনেক দূর হেঁটে যান। আবার সন্ধ্যার আগেই আশ্রমে ফিরে আসেন। আমাদের কাছাকাছি এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। তারপর হনহন করে আবার এগিয়ে গেলেন।

মিসেস খুরানা তাঁর নাক সিঁটকে বললেন : আশ্রমে ফিরেই কথাটা রাষ্ট্র করে দেবে।

কোন্ কথা?

এই যে আমাদের এখানে দেখে গেলেন, একটু রঙ দিলেই বেশ মুখরোচক হবে।

আমি বললাম : কিন্তু সবাই এখন নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। পরচর্চায় উৎসাহ কারও হবে না।

মিসেস খুরানা এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : তাহলে সেই কথাই রইল, কাল সকালে আমরা হরিদ্বারে যাচ্ছি।

এ প্রস্তাবে সম্মত হবার কোন বাসনা ছিল না, কিন্তু আমি আপত্তি জানাতেও পারলাম না। মিসেস খুরানা খুশী হয়ে বললেন : আসুন।

পুরাতন পথ ধরে আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম।



সন্ধ্যার আগেই আমরা আশ্রমে ফিরে এসেছিলাম। স্বপ্তি আমাকে দেখে হেসেছিল, আর চেন্নুলু তাকিয়েছিল ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে। কিন্তু পাধ্যে আমাকে কিছু বলেন নি। যথাসময়ে সকলের সঙ্গে উপাসনার মন্দিরে এসে সমবেত হয়েছিলাম।

তাউজীর সঙ্গে গুরুজী এসে তাঁর আসনে বসলেন। বিজলীর আলো নেই, প্রদীপ জ্বলছে। সেই স্নিগ্ধ আলোয় পরিবেশটি বড় পবিত্র মনে হয়। কোন গ্লানির কথা মনে থাকে না।

গুরুজী বললেন : আজ আমরা রাক্ষসের কথা বলব।

একটু থেমে বললেন : রাক্ষসের জন্ম কথায় একটু ফাঁক আছে। তাদের বংশ পরিচয় দৈত্য দানবের মতো সুলিখিত নয়। বিষ্ণুপুরাণে আমরা পাই যে মহর্ষি কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির যে তেরোটি কন্যা বিবাহ করেন, তাঁদেরই একজনের নাম হল খসা। যক্ষ ও রাক্ষসেরা খসার সন্তান সন্ততি। বিষ্ণুপুরাণে এর বেশি কিছু আমরা পাই নে। পাই রামায়ণে। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে মহর্ষি অগস্ত্য রামকে রাক্ষসদের কথা বলেছেন। কুবের তাঁর পিতা বিশ্রবা মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কোথায় থাকব? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্রবা বলেছিলেন, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে যে পর্বত আছে, বিশ্বকর্মা তার উপরে ইন্দ্রের অমরাবতীর মতো লঙ্কাপুরী নির্মাণ করেছেন রাক্ষসদের জন্য। কিন্তু রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে সেই পুরি পরিত্যাগ করে রসাতলে আশ্রয় নিয়েছে। তুমি সেই পুরীতে স্বচ্ছন্দে বাস কর।

পিতার আদেশ পেয়ে কুবের লঙ্কাপুরীতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। বহু রাক্ষসও তাঁর আশ্রয়ে বসবাস করতে লাগল।

গুরুজী বললেন : অগস্ত্যের মুখে এই গল্প শুনে রাম বিস্মিত হলেন। বললেন, আমরা শুনেছি যে রাক্ষসেবা পুলস্ত্যের বংশজাত, মানে তাঁরাও বিশ্রবা মুনির সন্তান, কাজেই কুবেরের আগে লঙ্কায় রাক্ষস এল কোথা থেকে?

অগস্ত্য রামের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ব্রহ্মা তাঁর নিজের সৃষ্ট প্রাণীর রক্ষার জন্য কতকগুলি জীবের সৃষ্টি করেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তারা ব্রহ্মার নিকটে এসে প্রশ্ন করে, আমরা কী করব? ব্রহ্মা বলেন, তোমরা মানুষদের রক্ষা কর। তাদের মধ্যে কেউ বলল, রক্ষামঃ; আর কেউ বলল, যক্ষামঃ। তাই শুনে ব্রহ্মা বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা রক্ষাম বলেছ তারা রাক্ষস ও যারা যক্ষাম বলেছ তারা যক্ষ হবে।

রামায়ণের এই গল্প আমার মনে ছিল না। কিন্তু যক্ষরাজ কুবের যে রাক্ষসরাজ রাবণের বড় ভাই সে কথা মনে আছে। এঁরা দুজনেই বিশ্রবা মুনির পুত্র, কিন্তু তাঁদের মাতা ভিন্ন। কুবেরের মাতা ভরদ্বাজকন্যা দেববর্ণিনী, আর সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী বা নিকষা হলেন রাবণের মাতা।

গুরুজী বললেন : রক্ষামঃ শব্দটি নিয়ে কোনো বিবাদ নেই। রক্ষামঃ মানে আমরা রক্ষা করব। কিন্তু যক্ষামঃ শব্দটির অনেকে অনেক রকম মানে করেছেন। কেউ বলেন, যক্ষামঃ মানে আমরা পূজা করব; কেউ বলেন, আমরা পালন করব। আবার কেউ বলেন, আমরা ভক্ষণ করব। ক্ষুধার্ত জীবেরা ভক্ষণ করার কথাই

ভেবেছিল। কিন্তু কার্যত যক্ষেরা ভক্ষণ করে নি, রাক্ষসেরাই মাঝে মাঝে মানুষ ভক্ষণ করেছে বলে শোনা গেছে।

রাক্ষস বংশে আমরা প্রথম নাম পাই হেতি ও প্রহেতির। তাদের পিতামাতার নাম অগস্ত্য বলেন নি। রামকে তিনি বলেছিলেন যে রাক্ষসদের মধ্যে মধু কৈটভের মতো দুই ভাই জন্মগ্রহণ করেন। তাদের নাম হেতি ও প্রহেতি। ধার্মিক প্রহেতি সন্ন্যাসী হয়ে তপোবনে গেলেন, আর হেতি যমের ভগিনী ভয়াকে বিবাহ করে সংসারী হলেন।

যমের ভগিনীর নাম যে যমুনা সে কথা আমরা গুরুজীর কাছে শুনেছি। যম সূর্যের পুত্র। ভয়া নামে সূর্যের কোন কন্যার নাম আমরা শুনি নি। কিন্তু গুরুজীকে এ কথা বলবার সাহস আমার হল না।

গুরুজী বললেন : এই ভয়ার পুত্রের নাম বিদ্যুৎকেশ, বিদ্যুৎকেশের বিবাহ হয়েছিল রাক্ষসী সন্ধ্যার কন্যা সালকটংকটার সঙ্গে। আমরা যেমন হেতি ও প্রহেতির পিতা মাতার নাম জানি নে, তেমনি সন্ধ্যার বংশ পরিচয়ও আমাদের অজানা। এর জন্য অসুবিধা মাত্র একটি। সেটি হচ্ছে এদের কাল নির্ণয়ের অসুবিধা। কোন পরিচিত নামের উল্লেখ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সময়ের হিসাব করতে পারি নে।

তাউজী বললেন : এই বংশেই তো রামের জন্ম, তখন আমরা সময়ের হিসাব পাব।

গুরুজী বললেন : আরও উপাদান আছে। তার থেকেই বোঝা যাবে যে সত্য যুগেও রাক্ষস ছিল। আমরা তাদের প্রবল দেখছি ত্রেতায়, সত্য যুগে তাদের প্রতিপত্তি বেশি ছিল না।

তার পরেই গুরুজী তাঁর গল্পের মধ্যে ফিরে এলেন। বললেন : বিদ্যুৎকেশের সঙ্গে বিবাহের কিছু পরে সালকটংকটা সন্তানসম্ভবা হলেন। কিন্তু তিনি মন্দার পর্বতে গিয়ে গর্ভ মোচন করে স্বামীর কাছে ফিরে এলেন। বৃষভে আরোহণ করে হরপার্বতী শূন্য মার্গে যাচ্ছিলেন। শিশুর কান্না শুনে তাঁরা মন্দার পর্বতে নেমে সেই রাক্ষস শিশুকে দেখতে পেলেন। পার্বতীর অনুরোধে শিব এই সদ্যোজাত শিশুকে মাতার সমবয়সী করে আকাশ ভ্রমণের শক্তি দান করলেন। পার্বতীও বর দিলেন যে রাক্ষসীরা গর্ভধারণ করেই সন্তান প্রসব করবে, আর সেই সন্তান হবে মাতার সমবয়সী।

বিদ্যুৎকেশের পুত্রের নাম হল সুকেশ। ইনি গ্রামণী নামে এক গন্ধর্বের কন্যা দেববতীকে বিবাহ করলেন। এঁদের তিন পুত্র হল। তাদের নাম মাল্যবান সুমালী ও মালী। এঁরা তিনজনে তেজস্বী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু স্বভাব হয়েছিল

উগ্র। সুমেরু পর্বতে গিয়ে কঠিন তপস্যা করে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করেছিলেন। তাঁর কাছে বর নিয়েছিলেন যে তাঁরা যুদ্ধে অজেয় ও শত্রুহন্তা, চিরজীবী ও প্রভুত্বশালী হবেন, এবং পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকবেন। এই বর পেয়েই তাঁরা অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। দেবতাদের উপরেও নির্ভয়ে উৎপীড়ন আরম্ভ করেন।

এই সময়ে তাঁরা বিশ্বকর্মাকে অনুরোধ করে নিজেদের জন্য লঙ্কাপুরী নির্মাণ করান। তারপর ত্রিকূট পর্বতের উপর এই নূতন পুরীতে তাঁরা সানুচর বাস করতে থাকেন। তাঁরা বিবাহ করেছিলেন নর্মদা নামে এক গন্ধর্বীর তিন কন্যাকে। এই কন্যাদের নাম সুন্দরী কেতুমতী ও বসুদা। মাল্যবান ও সুন্দরীর বিরূপাক্ষ প্রভৃতি পুত্র, সুমালী ও কেতুমতীর প্রহস্ত প্রভৃতি দশ পুত্র ও কুম্ভীনসী কৈকসী পুষ্পোৎ-ঘটা ও রাকা নামে চার কন্যা জন্মে। মালী ও বসুদার অনল নল হর ও সম্পাতি নামে চার পুত্র পরবর্তী কালে বিভীষণের মন্ত্রী হয়েছিলেন। কুম্ভীনসীর বিবাহ হয়েছিল মধু দৈত্যের সঙ্গে, আর কৈকসী বিবাহ করেছিলেন বিশ্রবা মুনিকে। রাবণ কুম্ভকর্ণ শূর্পণখা ও বিভীষণ এঁদেরই পুত্র কন্যা।

গুরুজী বললেন: কৈকসীর সঙ্গে বিশ্রবার বিবাহের গল্প বলবার আগে এঁদের আর একটু পরিচয় দিই। তাতে কাল নির্ণয়ের সুবিধা হবে। রাবণ বিবাহ করেছিলেন ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীকে, আর রাবণ কুম্ভকর্ণের বিবাহ দিয়েছিলেন দৈত্যরাজ বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সঙ্গে। ময়দানব ও বলির পৌত্রী উষাকে আমরা দ্বাপরেও দেখতে পাই।

তাউজী বললেন: এর থেকে আরও একটি সত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বলির দৌহিত্রীকে বিবাহ করলেন রাক্ষস কুম্ভকর্ণ ও তাঁর পৌত্রীর বিবাহ হল কৃষ্ণের প্রৌত্র অনিরুদ্ধর সঙ্গে।

গুরুজী বললেন: বিবাহ ব্যাপারে কোন গোঁড়ামি সে যুগে ছিল না। দেবতা ঋষি দৈত্য দানব রাক্ষস যক্ষ গন্ধর্ব নাগ বানর অপ্সরা ও মানুষ—এদের মধ্যে নির্বিচারে বিবাহ হত। দেবরাজ ইন্দ্র বিবাহ করেছিলেন পুলোমা দানবের কন্যা শচীকে, বিশ্রবা ঋষি রাক্ষসকন্যা কৈকসীকে বিবাহ করেছেন। রাক্ষস বিভীষণের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে গন্ধর্ব কন্যা সরমার। ময় দানব হেমা অপ্সরাকে বিবাহ করেছেন। রাক্ষস মেঘনাদের স্ত্রী সুলোচনা নাগকন্যা। মহাভারতের মানুষ ভীম হিড়িম্বা রাক্ষসীকে বিবাহ করেছিলেন। একটি দুটি নয়, এই রকম বিবাহের অসংখ্য নজির আছে পুরাণ গ্রন্থে।

আমার মনে হল যে সে যুগের সমাজ ব্যবস্থা বড় বিচিত্র ছিল। আজ যারা বিভিন্ন জাতি হিসাবে পরিচিত, তাদের মধ্যে খুব বড় ব্যবধান সেদিন ছিল না।

এই বিরাট দেশে ছোট ছোট সমাজের সৃষ্টি করে তারা আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বাস করত। আবার বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বন্ধনে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধও স্থাপিত হত।

গুরুজী বললেন: আকার আকৃতি দেখে যে এদের জাতি বিচার হত না, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অশোক বনে হনুমান সীতার নিকটে উপস্থিত হয়ে সীতাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি সুর অসুর নাগ গন্ধর্ব রক্ষ যক্ষ না কিন্নর ?

সুরাণাম সুরাণাঞ্চ নাগগন্ধর্বরক্ষসাম্।

যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ কা ত্বং ভবসি শোভনে॥

বাল্মীকির এই একটি মাত্র শ্লোক থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে বাহিরের আকার দেখে দেবাসুর নাগ গন্ধর্ব যক্ষ রক্ষ কিন্নরকে চেনা যায় না। তাদের পরিচয় প্রশ্ন করে জানবার অবকাশ রাখে। এ কথা সত্য বলে মেনে নিলে আরও একটি বড সত্যের সূত্র আমরা দেখতে পাই। পুরাকালে এই বিশাল ভারতে একটি সর্বভারতীয় সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। দেবাসুরের দ্বন্দ্ব সেই সভ্যতারই দ্বন্দ্ব। ছোট ছোট সমাজগুলি প্রথমে আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করেছিল। তারপর তারা বাধ্য হয়েছিল আত্মসমর্পণে। এক দিনে স্বেচ্ছায় তারা আত্মসমর্পণ করে নি, দুর্বলকে সবলেরা ধীরে ধীরে গ্রাস করেছিল।

গুরুজী খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন, তারপরে তাঁর পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন। বললেন: আমি মাল্যবান সুমালী ও মালীর কথা বলছিলাম। ব্রহ্মার কাছে বর পেয়ে এঁরা দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের উৎপীড়নে অস্থির হয়ে ঋষি ও দেবতারা প্রথমে শিবের কাছে গেলেন। শিব বললেন, এরা আমার অবধ্য, তোমরা বিষ্ণুর কাছে যাও। বিষ্ণুর কাছে গেলে তিনি তাঁদের নিশ্চিন্ত হতে বললেন, ভরসা দিলেন যে রাক্ষসদের তিনিই বধ করবেন।

মাল্যবান বড, ছোট সুমালী ও মালী। ছোট ভাইরা বড ভাইকে মন্ত্রণা দিলেন যে দেবতারা অন্যায় করেছেন, তাঁদর শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। বিষ্ণুর কাছে তাঁরা কোন অপরাধ করেন নি, দেবতারাই তাঁকে ভুল বুঝিয়েছে। অতএব রাক্ষসেরা বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে দেবতাদের আক্রমণ করতে চললেন। এই সংবাদ পেয়ে বিষ্ণু স্বয়ং এলেন যুদ্ধ করতে। তাঁর সামনে দাঁড়াতে না পেরে রাক্ষস সেনা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগল। মালী নিহত হলেন, মাল্যবান ও সুমালীও পরাজিত হয়ে পালিয়ে এলেন। তারপর আর লঙ্কায় নয়, সপরিবারে পাতালে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। লঙ্কাপুরী জনশূন্য হয়ে পড়ে রইল।

সুমালী এক দিন রসাতল থেকে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছিলেন। দেখতে

পেলেন যে বিশ্রবা মুনির পুত্র কুবের পুষ্পক রথে চলেছেন। অমনি তাঁর কন্যা কৈকসীর কথা মনে পড়ল। তিনি তখনই রসাতলে নেমে কন্যাকে বললেন, তোমার যৌবন অতীত হয়ে যাচ্ছে, এবারে তোমার বিবাহ করা উচিত। তুমি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা মুনিকে পতিত্বে বরণ কর।

গুরুজী বললেন : এই ব্যাপারে আমরা একটি অদ্ভুত সমাজ রীতির কথা জানতে পারি। সুমালী কুবেরকে দেখতে পেয়েছিলেন, কুবেরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবার কথা তাঁর মনে হয় নি, মনে হয়েছে কুবেরের পিতা বিশ্রবা মুনির কথা। কেন তিনি ধনাধিপতি লোকপাল কুবেরকে পছন্দ না করে বিশ্রবাকে পছন্দ করলেন, সে কথার উল্লেখ অগস্ত্য করেন নি। শ্রোতা রামও তা জিজ্ঞাসা করেন নি। মনে হয়, এর এমন কোন কারণ আছে যা সকলেরই জানা। হয়তো ঋষির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া সমাজে প্রতিষ্ঠার পরিচয় ছিল। কিন্তু আমি এই ঘটনাকে অদ্ভুত বলছি না, বলছি তার পরের ঘটনাকে। সুমালী তাঁর কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে বিশ্রবার কাছে গেলেন না, পাঠালেন তাঁর কন্যাকেই। কৈকসীকে যেতে হল তপস্যারত বিশ্রবার নিকটে। লজ্জায় অধোবদনে দাঁড়িয়ে পায়ের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগলেন। ঋষি তাঁকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি কার কন্যা ? আমার কাছে এসেছ কোন্ প্রয়োজনে ? প্রথম প্রশ্নের উত্তর কৈকসী সবিনয়ে দিয়েছিলেন, আমি সুমালীর কন্যা কৈকসী, তাঁরই আদেশে এসেছি আপনার কাছে। কিন্তু নারী সুলভ লজ্জায় দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। বলেছিলেন, আপনার কাছে আসবার অভিপ্রায় আপনি নিজের প্রভাবে বুঝে নিন।

আমার মনে হল, সুমালী রাক্ষসের ভয় ছিল যে তিনি নিজে ঋষির নিকটে বিবাহের প্রস্তাব আনলে হয়তো প্রত্যাখ্যাত হতেন। কন্যা গেলে সে আশঙ্কা কম। সুন্দরী নারীর জয় সর্বত্র। তার উপর ধর্মের কথা। নারীকে বিমুখ করা পুরুষের ধর্ম নয়। এই কারণেই সে যুগে কন্যা হরণ হত স্বয়ম্বর সভা থেকে। কন্যা যাকে মনে মনে বরণ করেছে, স্বয়ম্বর সভায় সে নিমন্ত্রিত হয়ে না এলে সভা থেকে সেই কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যেতে হত।

গুরুজী বললেন : বিশ্রবা ধ্যানস্থ হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন কৈকসীর অভিপ্রায়। বললেন, পুত্র লাভের জন্য তুমি এসেছ, কিন্তু এই প্রদোষ কাল বড় অসময়। তোমার পুত্ররা রাক্ষস হবে।

গুরুজীর এই কথা শুনে আমার মনে হল যে সুমালী রাক্ষসের মতলব আমি বুঝতে পেরেছি। সেকালের ঋষিরা পত্নীর মনোমত পুত্রের জন্ম দিতে পারতেন।

দিতি কশ্যপের নিকট ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র চেয়ে বঞ্চিত হন নি। সুমালীও তাঁর কন্যাকে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। কুবেরের সঙ্গে বিবাহ দিলে কন্যা সুখী হতে পারে, কিন্তু দেবতা বিজয়ী দৌহিত্র লাভ হবে না। সে আশা পূর্ণ হবে কোন ঋষির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলে।

গুরুজী বললেন : বিশ্রবার কথার উত্তরে কৈকসী বললেন, আপনি আমাকে দয়া করুন, দুরাচার পুত্রে আমার প্রয়োজন নেই। বিশ্রবা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার কনিষ্ঠ পুত্র হবে ধর্মাত্মা।

তারপর একে একে কৈকসীর চারটি সন্তান হল। প্রথমে নীলাঞ্জনবর্ণ রাবণ, দশানন বিংশতি বাহু বিশিষ্ট। দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ, তৃতীয় শূর্পণখা, বিভীষণ সর্ব কনিষ্ঠ।

রাবণের মনে ঈর্ষার প্রথম উন্মেষ হয় মাতা কৈকসীর কথায়। পুষ্পক রথে চড়ে কুবের এক দিন পিতা বিশ্রবার কাছে এসেছিলেন। কুবেরের মা হলেন ভরদ্বাজ ঋষিয় কন্যা দেববর্ণিনী। কুবের তাঁর পিতামহ পুলস্ত্যের নিকট ধনাধ্যক্ষ হবার বর পেয়েছিলেন, আর লোকপাল হয়েছিলেন ব্রহ্মার বরে। তার জন্য তিনি মহাবনে দু হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। পুষ্পক রথটিও তিনি ব্রহ্মার নিকট পেয়েছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর প্রপিতামহ। পুষ্পকরথ থেকে কুবেরকে নামতে দেখে কৈকসী রাবণকে বললেন, তোমার ভাই কুবেরকে দেখ, যাতে তাঁর সমান হতে পার সেই চেষ্টা কর। এ কথায় হয়তো কোন ঈর্ষার বীজ ছিল না, কিন্তু রাবণের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হল। রাবণ উত্তর দিলেন, তুমি দুঃখ কোরো না, আমি তাঁর চেয়েও বড় হব।

তারপর রাবণ ভাইদের নিয়ে তপস্যা করতে গেলেন। উগ্র তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে বর চাইলেন, আমি যেন দেবতা দৈত্য দানব রাক্ষস যক্ষ নাগ ও পক্ষীদের অবধ্য হই। বললেন, মানুষকে আমি তৃণজ্ঞান করি ও অন্যান্য প্রাণীদের কথাও ভাবি না।

তাউজী বললেন : ভারি আশ্চর্য কথা তো!

গুরুজী বললেন : কেন?

বাঘ ভালুককে ভয় পায় না, ভয় পায় পাখিকে।

গুরুজী বললেন : পাখি বলতে গরুড়ের কথা মনে পড়ে। ষাট হাজার বছরের বুড়ো জটায়ু ভাল যুদ্ধ করেছিল। থাক সে কথা। আমি ব্রহ্মার বরের কথা বলছিলাম। ব্রহ্মা রাবণকে তার অভীষ্ট বর দিলেন।

তারপর কুম্ভকর্ণ। কুম্ভকর্ণকে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী চাও? কুম্ভকর্ণ

বললেন, আমার ইচ্ছা যে আমি বহু বছর নিদ্রিত থাকি। ব্রহ্মা সহাস্যে বললেন, তথাস্তু।

এ আবার কী রকম বর ?

গুরুজী বললেন : এই কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রের দশজন অনুচর, সাতটি অপ্সরা ও অনেক ঋষি ও মানুষ ভক্ষণ করেছিল। ব্রহ্মা বর দিতে আসবার আগে দেবতারা তাই তাঁকে হাত জোড করে অনুরোধ করেছিল, কুম্ভকর্ণকে আপনি কোন বর দেবেন না। বর পেলে সে ত্রিভুবনটাই খেয়ে ফেলবে। ব্রহ্মা তাই সরস্বতীকে বলেছিলেন কুম্ভকর্ণের বাগদেবতা হতে। সরস্বতীর প্রভাবেই কুম্ভকর্ণ অমন অদ্ভুত বর চেয়েছিলেন। তারপর বুঝতে পেরেছিলেন দেবতাদের চালাকি।

বিভীষণ ধার্মিক ছিলেন। তিনি বর চেয়েছিলেন, বিপদেও যেন ধর্মে আমার মতি থাকে। ব্রহ্মা তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, রাক্ষস হয়েও তোমার এই ধর্মের মতির জন্য তোমাকে অমর হবার বর দিলাম।

ব্রহ্মার কাছে বর পেয়ে তিন ভাই ফিরে এলেন। রসাতলে সুমালী রাক্ষসও তাঁর দৌহিত্রদের খবর পেয়ে পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়লেন। ভাবলেন, আর ভয় কী! দৌহিত্ররাই এখন তাঁকে রক্ষা করতে পারবে।

এর পরে রাবণের বিবাদ হল কুবেরের সঙ্গে। হত না। সুমালী ও প্রহস্ত এই বিবাদ বাধালেন। সুমালী রাবণকে বললেন, তুমি ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছ, এবারে আমাদের লঙ্কাপুরী অধিকার করে রাক্ষসদের রাজা হও।

গুরুজী বললেন : রাবণের উত্তর শুনে আশ্চর্য হবে। রাবণ বলেছিলেন, কুবের আমাদের গুরুজন, তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত হবে না। রাবণের উত্তর শুনে সুমালী আর কিছু বলেন নি, কিন্তু তাঁর পুত্র প্রহস্ত নিরস্ত হলেন না। ভাগিনেয়কে একদিন বললেন, দেখ, বীরের এই ভ্রাতৃ প্রেমের কোন মানে হয় না। দেবতা ও অসুরও তো ভ্রাতা, পুরাকালে তাঁরা কী করেছিলেন!

রাবণ এ কথার উত্তর দিতে পারলেন না। খানিকক্ষণ চিন্তা করে মামাকে বললেন, আমি বড ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই নে। তবে আপনি কুবেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারেন। লঙ্কা রাক্ষসদের রাজধানী ছিল, ধর্ম রক্ষার জন্য এই পুরী তাঁর ফেরৎ দেওয়া উচিত।

প্রহস্তের মুখে এই কথা শুনে কুবের বললেন, লঙ্কাপুরী রাক্ষসশূন্য দেখেই আমার পিতা আমাকে এই পুরীতে বাস করতে বলেছিলেন। আমার যত্নে এখন এখানে অনেক রাক্ষস বসবাস করছে। তবে রাবণ যদি আসতে চায় তো আমার আপত্তি নেই। সে নির্বিঘ্নে এই রাজত্ব ভোগ করতে পারে।

তারপরে তিনি পিতাকে সব কথা জানালেন। বিশ্রবা মুনি সব শুনে বললেন, দুর্মতি রাবণ একবার আমার কাছেও এই প্রস্তাব করেছিল। আমি তাকে এই লোভ ত্যাগ করতে বলেছিলাম। কিন্তু যখন সে তা পারে নি, তখন তার সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয়। ব্রহ্মার বরে সে প্রবল হয়েছে, তোমারই লঙ্কা ত্যাগ করা ভাল। আমার ইচ্ছা যে তুমি কৈলাসে গিয়ে বসবাস কর।

কুবের আর দ্বিধা না করে সপরিবারে কৈলাসে চলে গেলেন। আর রাবণ সদলবলে এসে লঙ্কার অধিপতি হয়ে বসলেন।

কুবেরের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ল। সেই যুদ্ধে রাবণ কুবেরের পুষ্পক রথ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু গুরুজী সে কথা বললেন না। গুরুজী বললেন ঃ কুবেরের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল অনেক পরে। সে যুদ্ধ কৈলাসে হয়েছিল। তার আগে তাদের বিবাহ হয়েছিল।

রাবণ প্রথমে ভগিনী শূর্পণখার বিবাহ দেন দানবরাজ বিদ্যুৎজিহ্বের সঙ্গে। কালকেয় দৈত্যদের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের সময় ইনি নিহত হয়েছিলেন। সে স্বতন্ত্র গল্প। নিজে বিবাহ করেছিলেন ময় দানবের কন্যা মন্দোদরীকে। ময় দানব কশ্যপ ও দিতির পুত্র, কিন্তু বিবাহ করেছিলেন ইন্দ্র সভার অপ্সরা হেমাকে। মন্দোদরী এঁদের কন্যা। মায়াবী দুন্দুভি মন্দোদরীর দুই ভাই।

রাবণ এক দিন মৃগয়ায় গিয়ে ময় দানব ও মন্দোদরীকে দেখতে পেয়েছিলেন। মন্দোদরীর রূপের তুলনা ছিল না। লঙ্কায় হনুমান মন্দোদরীকে দেখে সীতা বলে ভুল করেছিলেন। রাবণ যখন মন্দোদরীকে দেখলেন, তখন তাঁর মাতা হেমা অপ্সরা নিকটে ছিলেন না। তিনি তখন দেবতাদের কাজে ত্রয়োদশ বর্ষ স্বর্গে আছেন। আর ময় মায়া বলে স্বর্ণ ও মনিমাণিক্যে এক মনোরম পুরী নির্মাণ করে সেখানে বাস করছিলেন, আর কন্যার জন্য সৎপাত্রের সন্ধান করছিলেন। মন্দোদরীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে রাবণ তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর নিজের পরিচয় দিলেন। রাবণকে মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র জেনে দানবরাজ ময় তাঁর কন্যার হাত রাবণের হাতে দিয়ে বললেন, মন্দোদরীকে তুমি পত্নী রূপে গ্রহণ কর। রাবণ আর দেরী করলেন না, অগ্নি সাক্ষী করে মন্দোদরীকে তখনই বিবাহ করলেন। ময় তাঁকে তপস্যায় লব্ধ শক্তি-অস্ত্র দান করলেন।

তারপর একে একে কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের বিবাহ হল। নিজে বিবাহ করে রাবণ লঙ্কায় ফিরে এসে বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সঙ্গে কুম্ভকর্ণের বিবাহ দিলেন, আর বিভীষণের বিবাহ দিলেন গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা সরমার সঙ্গে।

এর পরেই রাবণের বিবাদ বাধল কুবেরের সঙ্গে। তপস্যা করতে কুবের

হিমালয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে দেবী রুদ্রাণীকে দেখার ফলে তাঁর ডান চোখ দগ্ধ ও বাম চোখ পিঙ্গলবর্ণ হয়ে যায়। এর পরে তিনি বহু বৎসর কঠোর তপস্যা করলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব বললেন, তোমার মতো কঠিন তপস্যা আমি ভিন্ন আর কেউ পারে না। এখন থেকে তুমি আমার সখা হলে। কুবের নিজের গৃহে ফিরে এসে শুনলেন যে রাবণ অত্যাচারী হয়ে উঠেছেন এবং দেবতা ও ঋষিরা তাঁর বিনাশের চিন্তা করছেন। এই সংবাদ শুনে কুবের দুঃখিত হয়েছিলেন। রাবণ তাঁর ভ্রাতা, তাই তাঁকে উপদেশ দেবার জন্য লঙ্কায় দূত পাঠালেন।

লঙ্কায় এসে দূত সসম্মানে রাবণকে বললেন, মহারাজ, আপনার ভাই কুবের বলেছেন যে এত দিন ধরে অনেক দুষ্কর্ম করেছেন, এখন সচ্চরিত্র হয়ে ধর্মাচরণ করুন।

রাবণ এই উপদেশের কথা শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠে বললেন, ভেবেছিলাম বড ভাই গুরুজন, তাকে বধ করা উচিত নয়। কিন্তু তাঁর এই ধৃষ্টতা আমি ক্ষমা করব না। তোমাকে ও তাঁকে দুজনকেই মরতে হবে। বলে খড়্গের আঘাতে দূতকে বধ করলেন।

তাউজী যেন আর্তনাদ করে উঠলেন : দূত যে অবধ্য !

গুরুজী বললেন : সে পরবর্তী কালের কথা। এর আগে আমরা দূতের কথা শুনি নি।

তার পরের ঘটনা শোনবার জন্য আমরা কৌতূহলী হলাম।

গুরুজী বললেন : রাবণ আস্ফালন করে বললেন, এবারে আমি চার লোক-পালকেই যমালয়ে পাঠিয়ে ত্রিলোক জয় করব।

বলে প্রহস্ত মারীচ মহোদর শুক সারণ ও ধূম্রাক্ষ এই ছয় সচিব ও সেনাদল নিয়ে কৈলাসের দিকে যাত্রা করলেন।



কৈলাস পর্বতে যুদ্ধ হয়েছিল কুবেরের সঙ্গে রাবণের। রাবণকে বাধা দেবার জন্য যক্ষরা অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। তারপর

কুঁবেরের সেনাপতি মণিভদ্র সহস্র যক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে গেলেন। কিন্তু মায়াবী রাক্ষসদের নিকট তাঁরাও পরাজিত হলেন। শেষে কুবের এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। রাবণকে বললেন, দুর্মতি, আমি তোমার মঙ্গলের জন্য উপদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে কথা তুমি শোন নি। এর পরিণাম তোমাকে ভোগ করতে হবে।

দুজনের যুদ্ধ হল প্রবল। শেষ পর্যন্ত রাবণ গদাঘাতে কুবেরকে ভূপাতিত করলেন। তাঁর মন্ত্রীরা কুবেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। রাবণ কুবেরের পুষ্পক রথ অধিকার করে ত্রিভুবন জয়ের জন্য যাত্রা করলেন।

গুরুজী বললেন ঃ রাবণের চরিত্রের একটা দিক এখানে লক্ষ্য করা যায়। বড় ভাই কুবেরের পরামর্শে তিনি অপমানিত বোধ করেছিলেন। লঙ্কা থেকে কৈলাসে এসেছিলেন তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য। কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করেই তিনি মনে করলেন যে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কারও উপরে কোন অত্যাচার করেন নি, ধনাধিপতির ধনরত্ন স্পর্শ করেন নি। শুধু তাঁর দিগ্বিজয়ের সুবিধার জন্য পুষ্পক রথটি নিয়েই কৈলাস ত্যাগ করেছিলেন।

কিন্তু এই পুষ্পক রথ বেশি দূর অগ্রসর হল না। কার্তিকেয়র জন্মস্থান শরবনের নিকটে এসে রথের গতি রুদ্ধ হল। রাবণ বললেন, এই পর্বতে নিশ্চয়ই কেউ আছেন যিনি বাধা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রী মারীচ বললেন, বোধহয় এই বিমান আমাদের বহন করবে না। এই সব কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় শিবের অনুচর নন্দী এসে উপস্থিত হলেন। বামন বিকটাকার করাল দর্শন তিনি। রাবণকে বললেন, শঙ্কর এই পর্বতে ক্রীড়া করেন, তাই এ স্থান দেব দানব গন্ধর্ব নাগ যক্ষ রাক্ষসের অগম্য। এখান থেকে তোমরা ফিরে যাও।

পুষ্পক থেকে নেমে রাবণ বললেন, কে এই শঙ্কর ? বলে কৈলাসের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে তিনি নন্দীকে দেখলেন বানরমুখ, উজ্জ্বল শূল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রাবণ অবজ্ঞায় হাসলেন। এই হাসি দেখে নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, আজ আমার রূপ দেখে তুমি হাসছ ! এক দিন বানরের হাতেই তোমার বংশ ধ্বংস হবে।

রাবণ এই অভিশাপে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। বললেন, কোন্ বলে শঙ্কর এখানে রাজার মতো আছেন, তাই আমি দেখব। এই পর্বতটাকেই আমি উৎপাটিত করব। বলে সবলে কৈলাস উত্তোলন করতে লাগলেন।

শিবের অনুচর প্রমথরা ভয়ে কম্পিত হল, পার্বতী বিচলিত হয়ে শিবকে আশ্রয় করলেন। আর শিব তাঁর পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে একটুখানি চাপ দিলেন। রাবণের পক্ষে সেই চাপই যথেষ্ট। তাঁর বাহু নিপীড়িত হল, যন্ত্রণায় তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

তাঁর মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন, আর রক্ষা নেই। নীলকণ্ঠ মহাদেবকে কোন রকমে তুষ্ট করা দরকার। রাবণ রোদন করছিলেন, এবারে প্রণত হয়ে সাম গানে শিবের স্তব করতে লাগলেন।

এমনি করে সহস্র বৎসর কেটে গেল। তারপর মহাদেব তাঁর পাদাঙ্গুষ্ঠ সরিয়ে নিলেন। পর্বতের চাপ থেকে রাবণের বাহু মুক্ত হল। মহাদেব বললেন, তোমার বীরত্ব দেখে আমি প্রীত হয়েছি, তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম।

গুরুজী বললেন : এই ঘটনাতেই দশাননের নাম রাবণ হয়েছিল। পর্বতের চাপে তিনি দারুণ রব করেছিলেন বলে মহাদেব তাঁর নাম দিয়েছিলেন রাবণ। মুক্ত হয়ে রাবণ পালিয়ে যান নি। শিবকে বলেছিলেন, প্রভু, আমার বীরত্বে যদি প্রীত হয়ে থাকেন তো আমাকে একটি বর দিন। ব্রহ্মার বরে আমি দেবাদির অবধ্য, মানুষকে তৃণজ্ঞান করি। তবু আমার বাকি জীবন যাতে নিরাপদ হয় তার জন্য উপযুক্ত অস্ত্র দান করুন।

শিব তাঁকে চন্দ্রহাস নামে এক খড়্গ দিলেন।

রাবণ এবারে শিবকে প্রণাম করে পুষ্পকে চড়ে পৃথিবী জয়ের জন্য যাত্রা করলেন।

প্রথমে তাঁর বেদবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র মহর্ষি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী, মাথায় জটা, পরিধানে কৃষ্ণাজিন, রূপযৌবনসম্পন্না তাপসী হিমালয়ের অরণ্যে তপস্যারত। রাবণ তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলেন, বললেন, তুমি কে? এই নির্জন অরণ্যে তপস্যা করে তোমার রূপযৌবন কেন ব্যর্থ করছ?

অতিথির সৎকার করে বেদবতী বললেন, আমার নাম বেদবতী, পিতার বেদপাঠের সময় আমি বাঙ্ময়ী মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম বলে আমার এই নাম। পিতা বিষ্ণুর সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন বলে দেব গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস সকলকেই তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর এই কার্যের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে দৈত্যরাজ শুম্ভ আমার পিতাকে হত্যা করেছে। আর আমার মাতা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁর চিতায়। সেই থেকে আমি তপস্যা করছি, বিষ্ণুকে পাবার জন্যই আমার তপস্যা।

তারপর রাবণকে বললেন, তপোবলে আমি তোমাকে চিনেছি। তুমি যাও।

গুরুজী বললেন : এইখানে একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। বেদবতীর কথায় আমরা জানতে পারি যে দেব গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস তাঁর পাণিপ্রার্থী ছিলেন। দৈত্যরাজ শুম্ভ এসেছিলেন তাঁকে বিবাহের জন্য। মহর্ষি কুশধ্বজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন

বলে শুম্ভ তাঁকে হত্যা করেছিলেন, কিন্তু বেদবতীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ হরণ করে নিয়ে যান নি। অভিভাবকহীন কন্যা নিঃশঙ্ক চিত্তে হিমালয়ের অরণ্যে তপস্যা করছেন। পূর্বের পাণিপ্রার্থীরা তাঁকে তাঁর তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য এগিয়ে আসেন নি। রাবণই প্রথম পুরুষ, যিনি সমস্ত শুনে বললেন, মৃগনয়না, তোমার এত গর্ব ভাল নয়। কে তোমার বিষ্ণু, কোন্ বিষয়ে সে আমার সমকক্ষ? আমি লঙ্কার অধিপতি রাবণ, আমাকে বিবাহ করে তুমি সর্ব সুখের অধিকারী হবে।

বেদবতী কঠিন ভাবে উত্তর দিলেন, তুমি ছাড়া আর কোন বুদ্ধিমান নেই যে ত্রিলোকের অধিপতিকে অবজ্ঞা করবে।

রাবণ আর তর্ক না করে বেদবতীর কেশাকর্ষণ করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! অবিলম্বে বেদবতীর হাত অসিতে রূপান্তরিত হল। তিনি সেই হাতে তাঁর কেশ-পাশ ছিন্ন করে নিজেকে মুক্ত করলেন। তারপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে চিতায় আরোহণ করে বললেন, আর আমি বাঁচতে চাই নে। কিন্তু তোমাকে বধের জন্য আবার আমি জন্মাব।

গুরুজী বললেন: জলন্ত আগুনে বেদবতী তাঁর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেছিলেন জনক রাজার অযোনিজা কন্যা রূপে। বেদবতীই সীতা। মনুষ্য জন্মে বিষ্ণুকে পেয়েছিলেন পতি রূপে। আর তাঁরই জন্য রাবণ বধ সম্ভব হয়েছিল।

অভিশাপে রাবণের চিত্তে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হত কিনা সে কথা আমরা রামায়ণে পাই নে। নির্বিকার চিত্তেই তিনি উশীরবীজ দেশে এসে উপস্থিত হলেন। দেশের রাজা মরুত্ত তখন দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞ করছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির ভ্রাতা সংবর্ত এই যজ্ঞ করছিলেন। রাবণকে দেখে দেবতারাও ভয় পেলেন। ইন্দ্র যম বরুণ ও কুবের যথাক্রমে ময়ূর বায়স হংস ও কৃকলাসের রূপ ধারণ করলেন। বল দর্পে দর্পিত রাবণ যজ্ঞ স্থলে এসে মরুত্তকে বললেন, যুদ্ধ কর, নয় কর আত্মসমর্পণ। মরুত্ত যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হলেন। গুরু সংবর্ত বললেন, তুমি যজ্ঞে দীক্ষিত, ক্রোধে বা যুদ্ধে যজ্ঞ সমাপ্ত না হলে তোমার কুলক্ষয় হবে। রাবণ জয় ঘোষণা করে সেখান থেকে চলে গেলেন। আর দেবতারাও আবার নিজ নিজ রূপ ধারণ করলেন।

গুরুজী বললেন: এখানেও আমরা রাবণের চরিত্রের একটা দিক দেখতে পাই। রাবণ রাজা মরুত্তের যজ্ঞ নষ্ট করতে আসেন নি, এসেছিলেন দিগ্বিজয়ে। রাজাকে বধ করে সে রাজ্যের অধিকারও চান নি, এ শুধু তাঁর পরাক্রম প্রতিষ্ঠার

চেষ্টা। রামায়ণে আছে যে মরুত্তের যজ্ঞে উপস্থিত ঋষিদের রাবণ ভক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু এ কথা আমার সত্য বলে মনে হয় না। রাবণকে রাক্ষস রূপে চিত্রিত করবার জন্যই এই বীভৎস কাহিনী পরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

গুরুজীর এই মন্তব্য আমার ভাল লাগল। আকারে প্রকারে রাক্ষসদের সঙ্গে মানুষের বেশী প্রভেদ ছিল না বলেই আমার এই ধারণা জন্মেছে। রাক্ষসেরা বলশালী ছিল, আর তাদের সমাজ ছিল অন্য। মানুষ যে রাক্ষস কন্যা বিবাহ করেছে, সে কথা আমরা গুরুজীর মুখেই শুনেছি। রাবণের মাতা রাক্ষস কন্যা, আর পিতা একজন ঋষি। ঋষির পুত্র হয়ে ঋষিদের ভক্ষণ করবে, এ নিতান্তই অবিশ্বাস্য কথা। বিবাদ করে ঋষিদের হত্যা করেছেন বললে বিশ্বাস করা সম্ভব হত।

গুরুজী বললেন: রাবণ একে একে পৃথিবীর অনেক রাজাকে জয় করলেন। দুষ্মন্ত সুরথ গাধি গয় পুরূরবাকে জয় করে অযোধ্যায় অনরণ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। আর সকলের মতো অনরণ্য বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করলেন না। তাঁর বিক্রমে রাবণের সৈন্যরা পলায়ন করল, প্রহস্ত মারীচ শুক ও সারণও পালিয়ে গেলেন। কিন্তু রাবণের করতলের আঘাতে অনরণ্য রথ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। রাবণ সহাস্যে বললেন, বিলাসে ডুবে থাকলে আমাকে চিনবে কেমন করে! কী লাভ হল যুদ্ধ করে?

অনরণ্য বললেন, অত অহঙ্কার ভাল নয় রাক্ষস। আমার নিয়তি আমাকে টেনেছে, তার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে আমার বংশধরের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রেই অনরণ্যের মৃত্যু হল। আর রাবণ দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হলেন সগৌরবে।

তাউজী বললেন: এই অনরণ্যের বংশেই কি রামের জন্ম হয়েছিল?

গুরুজী বললেন: ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা অনরণ্য অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। রামও এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। অনরণ্যের অভিশাপ যে রাবণ গ্রাহ্য করেন নি, তাতে সন্দেহ নেই। এই অভিশাপে যদি তিনি ভয় পেতেন তাহলে মৃত রাজা অনরণ্যকে নির্বংশ করে যেতেন। পরবর্তী কালে এই বংশে রামের জন্ম রাবণের মহানুভবতার প্রমাণ।

তারপর গুরুজী নারদের কথা বললেন: দেবর্ষি নারদ এক দিন মেঘে আরোহণ করে রাবণের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, বৎস, মানুষ হত্যা তোমার শোভা পায় না। জরা শোক মোহে তারা নিজেরাই জর্জরিত, বিধির বিধানে

সকলেই যমালয়ে যাবে। মানুষ না মেরে তুমি যমকে জয় কর, তোমার সর্বজয়ী নাম হবে।

নারদের এ পরামর্শ রাবণের ভাল লাগল। বললেন, সেই ভাল। তারপর সোৎসাহে দক্ষিণে যাত্রা করলেন। ও দিকে নারদ যমের কাছে গিয়ে বললেন, সাবধান, রাবণ আসছে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

দেখতে দেখতেই রাবণের বিমান এসে যম লোকে উপস্থিত হল। রাবণ সেখানে ধার্মিক ও পাপীদের দেখতে পেলেন। ধার্মিকরা সুখে বাস করছেন, আর পাপীদের শাস্তি হচ্ছে নানা রকম। তাদের দুর্দশা দেখে রাবণ তাদের মুক্ত করে দিলেন। যম সেনারা যুদ্ধ করতে ছুটে এল, কিন্তু রাবণের পাশুপত অস্ত্রে তারা দগ্ধ হয়ে যেতে লাগল। শেষে যম স্বয়ং এলেন রণস্থলে। তাঁর সামনে মৃত্যু, পাশে কালদণ্ড। রাবণের সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু রাবণ নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করতে লাগলেন সাত রাত্রি অতীত হবার পর যম কালদণ্ড উদ্যত করলেন।

ঠিক এই মুহূর্তে এলেন ব্রহ্মা। যমকে বললেন, স্থির হও, সংবরণ কর তোমার কালদণ্ড। যম ব্রহ্মার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। ব্রহ্মা বললেন, রাবণকে আমি বর দিয়েছি। তোমার কালদণ্ডে তার মৃত্যু হলে আমার বর মিথ্যা হয়ে যাবে। আর তা ব্যর্থ হলে আমার সৃষ্ট কালদণ্ডই মিথ্যা হবে। এ দুয়ের কোনটাই আমি চাই না। যম বলবেন, প্রভু, আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য করলাম। বলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন। রাবণও জয় ঘোষণা করে যম লোক ত্যাগ করলেন।

তারপর রাবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে নাগদের বশ করলেন, কিন্তু নিবাত কবচ নামে দৈত্যদের সঙ্গে এক বৎসর যুদ্ধ করেও জয়ী হতে পারলেন না। ব্রহ্মা এসে যুদ্ধ বন্ধ করতে বললেন, তার কারণ তারাও তাঁর বরে অজেয় হয়েছেন। এখান থেকে রাবণ অশ্মনগরে গিয়ে চার শো কালকেয় দৈত্যকে বধ করলেন। এই যুদ্ধে শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বও নিহত হলেন।

তারপরে রাবণ বরুণালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। খবর পেয়ে বরুণের পুত্র ও পৌত্ররা সেনাপতিদের নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন। রাবণ তাঁদের পরাজিত করে বললেন, বরুণকে পাঠাও। হয় সে যুদ্ধ করুক, নয় আমার বশ্যতা স্বীকার করুক। বরুণের মন্ত্রী বললেন, তিনি গান শুনতে ব্রহ্মলোকে গেছেন, আর এখানে উপস্থিত সকলে পরাজিত হয়েছি।

কাজেই রাবণ বিজয় ঘোষণা করে বরুণালয় থেকে ফিরলেন। পথে তিনি দৈত্যরাজ বলির পুরী দেখতে পেলেন। রাবণ নিকটে আসতেই বলি তাঁকে কোলে

তুলে নিয়ে বললেন, কী চাও তুমি? রাবণ বললেন, আমি আপনাকে বিষ্ণুর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারি। বলি সহাস্যে বললেন, তার প্রয়োজন নেই। তার বদলে তুমি তোমার শক্তির সামান্য পরীক্ষা দাও। ঘরের কোণে ঐ যে কুণ্ডলটি পড়ে আছে, ওটি তুমি আমার কাছে আন। রাবণ সেটি তুলতে গিয়ে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর দুর্দশা দেখে বলি হেসে বললেন, ওটি আমাদের পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল। যে বিষ্ণু তাঁকে বধ করেছিলেন, এখন তিনিই আমার দ্বার রক্ষা করছেন। এ কথা শুনেই রাবণ বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলেন। বিষ্ণু রাবণকে পরে বধ করবেন ভেবে অন্তর্হিত হলেন। রাবণ নিজের জয় হল ভেবে সগৌরবে সেখান থেকে যাত্রা করলেন।

শূন্য মার্গে যে রাজারা স্বর্গে যাচ্ছিলেন, রাবণ তাঁদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু এক মান্ধাতা ছাড়া আর কেহ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি। মান্ধাতার সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হলে মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব এসে এই যুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন।

রাবণ সূর্য লোকে গিয়েছিলেন, কিন্তু সূর্য যুদ্ধ করেন নি। চন্দ্র লোকে চন্দ্র যুদ্ধ করে কাবু হয়েছিলেন। ব্রহ্মা এসে তাঁকে রক্ষা করেন।

এর পর রাবণ পশ্চিম সমুদ্রের একটি দ্বীপে ভগবান কপিলের হাতে নিপীড়িত হয়ে লঙ্কার দিকে এলেন।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে গুরুজী বললেন: এ পর্যন্ত রাবণকে অত্যাচারী রূপে চিত্রিত করা হয় নি। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে তারপর সহসা বলা হল যে দিগ্বিজয় করে ফেরার পথে রাবণ রাজা ঋষি দেবতা ও দানবের যত সুন্দরী কন্যা দেখেছিলেন তাদের আত্মীয় বন্ধুকে বধ করে সেই সব কন্যাকে হরণ করে আনলেন। বিমান প্লাবিত হল তাদের অশ্রুতে, আর তারা অভিশাপ দিল যে 'এই পরস্ত্রী নিগ্রহের পাপেই রাবণ নিহত হবে পরস্ত্রীর জন্য। নিতান্ত সংক্ষেপে লেখা হয়েছে রাবণের এই কন্যা হরণের কাহিনী। আমার মনে হয়েছে যে রাবণ সম্বন্ধে এ কথা সত্য হলে সবিস্তারে এই কাহিনী বিবৃত হত, যেমন করে বেদবতী ও রম্ভার কাহিনী লেখা হয়েছে।

গুরুজী একটু থেমে বললেন: নারী হরণ সর্ব কালেই প্রচলিত ছিল। স্বয়ংবর সভা থেকে কন্যা হরণ ছিল প্রশংসনীয়। বহু বিবাহ সমাজে নিন্দিত হয় নি। দ্বারকায় কৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নী ছিল। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা নরককে হত্যা করে তিনি এদের সংগ্রহ করেছিলেন। রাবণ যদি যুদ্ধ করে কিছু দেবতা ও ঋষির কন্যা হরণ করেন, তাহলে তা অসামাজিক বলে আমরা নিন্দা করতে পারি

না। অবশ্য এ কথা মিথ্যা হলে রাবণকে আমরা আদর্শ চরিত্র বলে বর্ণনা করবার সুযোগ পেতাম।

লঙ্কায় বিমান থেকে নেমেই রাবণ বাধা পেলেন তাঁর ভগিনী শূর্পণখার কাছে। শূর্পণখা তাঁর পদতলে পড়ে চিৎকার করে উঠলেন, নিজের ভগিনীপতিকে বধ করেও তোমার লজ্জা হচ্ছে না। শেষে তুমি আমাকে বিধবা করলে!

রাবণ সস্নেহে বললেন, দুঃখ কোরো না বোন, ইচ্ছা করে আমি এ কাজ করি নি। যুদ্ধের সময় তোমার স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বকে আমি চিনতে পারি নি। মত্ত হয়ে আমরা যুদ্ধ করি, তার জন্যেই এই রকম হয়। এখন তুমি এক কাজ কর। খর ও দূষণ আমাদের মাসতুতো ভাই। খরকে আমি চোদ্দ হাজার রাক্ষসের প্রভু করে দণ্ডকারণ্যে পাঠাচ্ছি, দূষণ তার সেনাপতি হবে। তারা তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আমি তোমার যে ক্ষতি করেছি, তার কিছু আমি তোমাকে দান মান ও প্রসাদ দিয়ে পূরণ করে দেব।

তারপর রাবণ নিকুম্ভিলা উপবনে গেলেন। মেঘনাদ সেখানে কৃষ্ণাজিন পরে যজ্ঞ করছিলেন। সপ্ত যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে। তিনি তামসী মায়া নানা অস্ত্র শস্ত্র ও আকাশগামী বিমান লাভ করেছেন। কিন্তু রাবণ এই যজ্ঞ দেখে সন্তুষ্ট হলেন না। গুরু শুক্রাচার্যকে বললেন, আমার শত্রুদের আপনি পূজা করছেন, এ ভাল নয়।

গুরুজী বললেন: রাবণ তখনও ইন্দ্রাদি দেবতাকে জয় করেন নি। দেবতাদের শত্রু বলেছেন, কিন্তু নিজের পুত্র এই শত্রুদের পূজা করছে জেনেও কঠিন কোন মন্তব্য করেন নি। এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে রাজপুরীতে ফিরে গেলেন।

রাবণের সঙ্গে অপহৃতা কন্যা দেখে বিভীষণ তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, এই গর্হিত কাজের জন্য তোমার যশ ও কুল নষ্ট হবে। হবে বলছি কেন, হয়েছে বলা উচিত। রাবণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী রকম? বিভীষণ বললেন, মধু দৈত্য আমাদের ভগিনী কুম্ভীনসীকে হরণ করে নিয়ে গেছে। কুম্ভকর্ণ নিদ্রা-মগ্ন ছিলেন, আমি ছিলাম তপস্যারত, আর মেঘনাদ যজ্ঞ করছিল। এই সুযোগে মধু আমাদের সৈন্যদের নিহত করে অন্তঃপুর থেকে তাকে নিয়ে গেছে।

গুরুজী বললেন: এই কুম্ভীনসী তাঁদের মাসি নন, মাল্যবানের দৌহিত্রী, অনলার কন্যা। রাবণ এই সংবাদ পেয়ে তখনই আবার সসৈন্যে যাত্রা করলেন। মধু দৈত্যের বাস মধুপুরে, সেখানে উপস্থিত হতেই কুম্ভীনসী এসে রাবণের পায়ে পড়লেন, বললেন, দোহাই তোমার দাদা, তুমি আমাকে বিধবা কোরো না। তারা সুখে সংসার করছে দেখে রাবণ বললেন, মধু কোথায়? তাকে নিয়ে আমি

স্বর্গ রাজ্য জয় করতে যাব। বড় ভাই-এর কথায় কুম্ভীনসী আশ্বস্ত হলেন, নিদ্রিত মধুকে তাঁর কাছে ডেকে দিলেন। তারপর একটি রাত তাদের কাছে সুখে কাটিয়ে পর দিন স্বর্গ রাজ্য আক্রমণের জন্য কৈলাস পর্বতে শিবির স্থাপন করলেন।

রাত্রে সৈন্যরা ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু রাবণ ঘুমোলেন না। তিনি বাইরে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। চাঁদ উঠেছে, সেই আলোয় ফুলের বাহার দেখা যাচ্ছে, আর শীতল বাতাস বইছে অল্প অল্প। দূর থেকে কিন্নরীদের গানের সুর বাতাসে ভেসে আসছে। এমনি সময় রাবণ স্বর্গের অপ্সরা রম্ভাকে দেখতে পেলেন অভিসারিকার বেশে চলেছেন। রাবণ তাঁর হাত ধরে বললেন, এমন সময় তুমি কার কাছে যাচ্ছ? আমি ত্রিলোকপতি রাবণ, আমার কাছে তুমি খানিকক্ষণ থেকে যাও।

রম্ভা ভয় পেয়ে বললেন, আমি আপনার পুত্রবধূ, আমাকে আপনি ছেড়ে দিন। তারপর নিজের সম্বন্ধটা বুঝিয়ে বললেন, আমি আপনার ভাই কুবেরের পুত্র নল-কুবেরের কাছে যাচ্ছি। রাবণ হেসে বললেন, তুমি তাঁর একনিষ্ঠা স্ত্রী হলে তোমাকে পুত্রবধূ বলে সম্মান করতেই হত। কিন্তু তোমাদের তো পতি নেই, আর দেবতারাও এক স্ত্রীতে আবদ্ধ থাকেন না। বলে রাবণ সবলে রম্ভাকে কাছে টানলেন।

রম্ভার কাছে এই কথা শুনে নলকুবের রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সবলে কোন নারীকে গ্রহণ করলে তাঁর মাথা সপ্তধা ভেঙ্গে পড়বে।

গুরুজী বললেন: নলকুবেরের এই শাপের জন্যই রাবণ সীতাকে অশোক বনে রেখেছিলেন, সীতাকে বশে আনবার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন বল প্রয়োগ করেন নি।

গুরুজী একটু থেমে বললেন: তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। নলকুবেরের শাপের কথা রাবণ জানলেন কী করে! বেদবতীর শাপের কথা জানতেন, জানতেন রাজা অনরণ্যের শাপের কথাও। কিন্তু তার জন্য তো তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। আমার মনে হয়েছে যে রাবণের ধর্ম বোধ ছিল। সেই জন্যই তিনি সীতাকে এনে সরাসরি রাজপুরীতে তোলেন নি। তিনি চেয়েছিলেন যে সীতা স্বেচ্ছায় কিংবা তাঁর অনুরোধে লঙ্কার রাণী হতে রাজী হবেন। থাক সে কথা, আমরা রাবণের দিগ্বিজয়ের কথা বলছিলাম। রাবণ কৈলাস পেরিয়ে ইন্দ্র লোক আক্রমণ করলেন।

এই কথায় ইন্দ্র লোকের অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা হচ্ছে। কৈলাস পেরিয়ে ইন্দ্র লোক। এই কৈলাস যদি আধুনিক কৈলাস হয় তো ইন্দ্র লোক ছিল তিব্বতে বা আরও উত্তরে সুমেরুর নিকটে। নানা পুরাণ থেকে

এই সব পৌরাণিক স্থান নির্ণয়ের জন্য গবেষণার অবকাশ আছে।

তারপর গুরুজী ইন্দ্রের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের কথা বললেন। রাবণের আক্রমণে ভয় পেয়ে ইন্দ্র প্রথমেই বিষ্ণুর শরণ নিয়েছিলেন। বিষ্ণু বললেন, ব্রহ্মার বরে রাবণ অজেয় হয়েছে, আমি এখন তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না। তবে তোমাকে কথা দিচ্ছি যে সময় হলে আমি তাকে বধ করব। এখন তুমি নিজেই সাহস করে যুদ্ধ কর।

উপায়ান্তর না দেখে ইন্দ্র দেবতাদের পাঠালেন যুদ্ধক্ষেত্রে। রুদ্র আদিত্য বসু ও মরুদ্‌গণ এলেন যুদ্ধ করতে। রাক্ষসের পক্ষে রাবণের মাতামহ সুমালী প্রহস্ত মারীচ ও অন্যান্য বীর রাক্ষসকে নিয়ে মুখোমুখি হলেন। দু পক্ষেই অনেক হতাহত হল। আর সুমালী নিহত হলেন অষ্টম বসুর গদাঘাতে। তারপর রাবণের পুত্র মেঘনাদের সঙ্গে ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্তের সংগ্রাম আরম্ভ হল। মেঘনাদের বিক্রমে দেবতারা জয়ন্তকে ফেলে পালিয়ে গেলেন। এই সময় দানবরাজ পুলোমা এসে জয়ন্তকে রক্ষা করলেন। জয়ন্ত পুলোমার দৌহিত্র, দৌহিত্রকে নিয়ে পুলোমা সমুদ্রে আশ্রয় নিলেন।

ইন্দ্র ভাবলেন যে তাঁর পুত্র নিহত হয়েছে। তখন তিনি নিজে এলেন রণ-স্থলে। আবার ঘোর যুদ্ধ বাধল। ইন্দ্রের অস্ত্রে অসংখ্য রাক্ষস নিহত হল। রাবণ তাঁর সারথিকে বললেন, এই নন্দন কানন থেকে শত্রু সৈন্যের মধ্য দিয়ে উদয় পর্বতে চল। রাবণ অগ্রসর হতেই ইন্দ্র তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন। দেবতাদের বললেন, রাবণকে বধ করা তো সম্ভব নয়, তাকে জীবিত অবস্থাতেই ধর। দেবতারা চারি দিক থেকে রাবণকে বেষ্টন করলেন। তখন মেঘনাদ মায়া বলে অদৃশ্য হয়ে আকাশ থেকে ইন্দ্রকে আক্রমণ করলেন এবং মায়া বলেই তাঁকে বন্ধন করে রাবণের কাছে নিয়ে এলেন। বললেন, আর যুদ্ধ কেন, দেবরাজকে আমি বন্ধন করেছি, আপনি এখন স্বচ্ছন্দে স্বর্গ সুখ ভোগ করুন। রাবণ বললেন, ইন্দ্রকে তুমি লঙ্কায় নিয়ে যাও, আমিও যাচ্ছি।

রাবণ যখন লঙ্কায় ফিরলেন, তখন ব্রহ্মা এলেন তাঁর কাছে। অন্তরীক্ষ থেকে তিনি বললেন, বৎস, তোমার পুত্র মেঘনাদ যুদ্ধে অদ্ভুত কীর্তি স্থাপন করেছে, জগতে সে ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত হবে। তোমারও তো ত্রিলোক জয়ের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, এখন তুমি কি শর্তে ইন্দ্রকে মুক্তি দেবে তাই বল।

এ কথার উত্তর দিলেন মেঘনাদ। তিনি বললেন, আমাকে অমরত্ব দিন। ব্রহ্মা বললেন, পৃথিবীর কোন প্রাণী অমর হতে পারে না, তুমি অন্য বর নাও। মেঘনাদ বললেন, তবে এই বর দিন যে অগ্নির পূজা সমাপ্ত করে যুদ্ধে নামলে আমি

অবধ্য হব। তপস্যায় অমরত্ব আমি চাই নি, আমি অমর হতে চাই বিক্রমে। ব্রহ্মা তাঁকে সেই বর দিয়ে ইন্দ্রকে মুক্ত করে নিয়ে গেলেন।

গুরুজী বললেন : রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে একটি অদ্ভুত কথা আছে। রাম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাবণ যখন অত্যাচার করে বেড়াতেন, তখন কেউ প্রতিবাদ করতেন না কেন! পৃথিবীতে কি তখন কোন বীর ছিল না? রামের এই অভিযোগ অগস্ত্য মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা কি এ কথা মেনে নিতে পারি? রাবণ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে অভিযান করে সকলকে পরাজিত করেছেন সত্য, কিন্তু তাকে তো অত্যাচার বলে না। সে দিগ্বিজয় পুরুষের গৌরব বৃদ্ধি করে। যদি যুদ্ধ করে দেব ও দানব কন্যা হরণ করে এনে থাকেন তো সেও পৌরুষেরই কথা, অত্যাচারের কথা নয়। কবি বাল্মীকি রাবণকে অত্যাচারী বলে চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছেন বলে আমার মনে হয় না। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে আমরা রাবণের যে বৃত্তান্ত পাই, তা পরবর্ত্তী কালের রচনা বলেই অনুমান করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা এসে পড়ে। রাবণের দীর্ঘ জীবনের কথা। এই উত্তর কাণ্ডেই আমরা দেখেছি যে অযোধ্যার রাজা অনরণ্য রাবণকে শাপ দিয়েছিলেন যে তাঁরই কোন বংশধর রাবণকে বধ করবেন। অনরণ্য ইক্ষ্বাকু বংশের পঞ্চম রাজা। ব্রহ্মার মানস পুত্র মরিচীর পুত্র কশ্যপ, সূর্য কশ্যপের পুত্র, সূর্য থেকে সূর্য বংশ। মনু সূর্যের পুত্র, মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। হিসাব করে দেখা গেছে যে অন-রণ্যের সাতাশ পুরুষ পরে রামের জন্ম। যুদ্ধে রাবণ অনরণ্যকে বধ করেছেন, আর নিজে নিহত হয়েছেন রামের হাতে। এ কথা আমাদের অবিশ্বাস্য বলতেই হবে।

গুরুজী বললেন : বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা থাক। আমরা রাবণের কথা বলি। অগস্ত্য রামকে বললেন. পৃথিবীর দুজন রাজার কাছে রাবণ পরাজিত হয়েছেন। প্রথমবার হৈহয় রাজ অর্জুনের নিকট, আর দ্বিতীয়বার কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বালির কাছে। রাবণ এক দিন মাহিষ্মতী নগরীতে এসে হৈহয় রাজের অমাত্যদের প্রশ্ন করলেন, তোমাদের রাজা কোথায়? অমাত্যরা বললেন, তিনি এখন রাণীদের সঙ্গে নর্মদায় জলকেলি করছেন। হৈহয় রাজধানী মাহিষ্মতী ছিল বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশের শহর মহেশ্বরে। নর্মদা নদী দেখবার জন্য রাবণ গিয়ে বিন্ধ্য পর্বতে উঠলেন। তারপর নর্মদা প্রপাতের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে নদীতে স্নান করে শিবের পূজা করলেন। এমন সময় একটি আশ্চর্য জিনিস তিনি দেখলেন। নর্মদার জল সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত না হয়ে বিপরীত দিকে

বাড়ছিল। তার কারণ জানা গেল যে অর্ধ যোজন দূরে এক বিরাট পুরুষ তাঁর সহস্র বাহু দিয়ে নদীর স্রোত রুদ্ধ করে সুন্দরী নারীদের সঙ্গে জলবিহার করছেন। দত্তাত্রেয় ঋষির বরে কার্তবীর্যার্জুনের সহস্র বাহু হয়েছিল। কাজেই রাবণ বুঝলেন যে তিনিই হৈহয়-রাজ কার্তবীর্যার্জুন। রাবণ তখনি যুদ্ধ করতে চললেন। রাজার অমাত্যরা বললেন, তিনি এখন নারীদের সঙ্গে মত্ত আছেন, আপনি কাল তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুন। আর অপেক্ষা করতে না চাইলে আগে আমাদের পরাজিত করুন।

রাবণ অপেক্ষা করতে রাজী ছিলেন না বলে অমাত্যদের সঙ্গেই যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। খবর পেয়ে অর্জুন গদা হস্তে এসে উপস্থিত হলেন। তার পর রাবণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। রাবণের বিশ হাত, আর অর্জুনের হাত এক হাজার। অর্জুন রাবণকে তাঁর বাহুর ভিতর বন্ধন করে নিজের পুরীতে নিয়ে এলেন। এর পূর্বে এ রকম পরাজয় রাবণের কখনও হয় নি।

সংবাদ পেয়ে রাবণের পিতামহ পুলস্ত্য এসে অর্জুনের কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন, মহারাজ, তোমার বিক্রমের তুলনা নেই। দুর্জয় রাবণকে বন্ধন করে তুমি তোমার যশ প্রচার করেছ। আমার অনুরোধে এখন তুমি একে মুক্তি দাও। পুলস্ত্যের কথায় রাবণ ও অর্জুন অগ্নি সাক্ষী করে সখ্যতা স্থাপন করলেন।

গুরুজী বললেন : এই পরাজয়ে রাবণের লজ্জা হয় নি। মুক্তি পেতেই আবার সদর্পে কিষ্কিন্ধ্যায় এলেন বানররাজ বালির সঙ্গে যুদ্ধ করতে। বালি তখন চতুঃ-সমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনা করছিলেন। তাঁর অমাত্যরা বললেন, এই যে অস্থিরাশি দেখছেন, এ আপনারই মতো যুদ্ধার্থীর। এখানে অপেক্ষা করুন, আপনারও এই দশা হবে। আর মরবার জন্য বেশি ব্যস্ত হয়ে থাকলে দক্ষিণ সমুদ্রে যান।

রাবণ তাঁর পুষ্পক রথে চড়ে দক্ষিণ সমুদ্রে এসে উপস্থিত হলেন। সমুদ্র তীরে বালি সন্ধ্যাবন্দনা-রত। হিমগিরির মতো তাঁর দেহ, বালার্ক সদৃশ মুখ। রাবণ তাঁকে ধরবার জন্য রথ থেকে নেমে নিঃশব্দে অগ্রসর হলেন। বালি তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছিলেন, তিনিও নিঃশব্দে নিশ্চল হয়ে মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। তার পর পদ শব্দে রাবণ নিকটস্থ হয়েছেন বুঝেই তাঁকে বক্ষে ধারণ করে আকাশে উঠলেন। মুক্ত হবার জন্য রাবণ অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। বালি একে একে চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনা করে রাবণকে নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরলেন। সেখানকার উপবনে রাবণকে নামিয়ে বালি সহাস্যে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পরাজিত রাবণ তাঁর পরিচয় জানাতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করলেন না, বললেন, আমি রাক্ষসরাজ রাবণ। তোমার বলবীর্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তুমি আমাকে পশুর মতো চতুঃ-সমুদ্রের জল খাইয়েছ। তার পরেই তিনি সন্ধির প্রস্তাব করলেন বালির কাছে।

বললেন, অগ্নি সাক্ষী করে আমি তোমার সঙ্গে চিরস্থায়ী সখ্য স্থাপন করতে চাই। আমাদের যা আছে, তা আমাদেরই থাক।

বালি এতে আপত্তি করেন নি। রাবণ এক মাস কিষ্কিন্ধ্যায় কাটিয়ে লঙ্কায় ফিরে গিয়েছিলেন।

গুরুজী বললেন : রাবণ সম্বন্ধে এই হল প্রাক্ রামায়ণ কথা। এর থেকেই রাবণের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটি ধারণা করতে পারি। ঋষির পুত্র রাবণ যে শৈশবে ঋষির পুত্রের মতো মানুষ হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন করেছেন, যাগযজ্ঞ করা শিখেছেন। মায়ের ইচ্ছায় কঠিন তপস্যাও করেছেন। সেকালে ব্রহ্মচর্য ও তপস্যাতেই শক্তি সঞ্চয় হত। রাবণও সেই শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম বুদ্ধিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে তিনি বিবাদ করতে চান নি, তাঁকে ভক্তি করেছেন গুরুজন বলে। পিতার আদেশে কুবের লঙ্কা ত্যাগ করার পরেই তিনি লঙ্কার অধিপতি হয়ে বসেন।

দেবতা ও ঋষিদের উপর রাবণ কী অত্যাচার করেছেন আমাদের জানা নেই। তাই কুবের যে দূত পাঠালেন রাবণের কাছে তার উদ্ধত ব্যবহারেই তিনি তাকে বধ করে কুবেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করে শুধু তাঁর বিমানখানি কেড়ে নিয়েছিলেন। সে তাঁর দিগ্বিজয়ের সুবিধার জন্যেই নিয়েছিলেন।

সে যুগের প্রায় সমস্ত শক্তিমান পুরুষের সঙ্গেই রাবণ যুদ্ধ প্রার্থনা করেছিলেন। কেউ যুদ্ধ করেন নি, কেউ যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছেন, আবার কারও সঙ্গে যুদ্ধের ফলাফল নির্ণীত হয় নি। রাবণ নিজেও পরাজিত হয়েছেন। রাজ্য জয়ের বাসনা তাঁর ছিল না, শুধু শক্তির পরীক্ষাতেই যুদ্ধ হয়েছে। রাবণ বীর ছিলেন, নির্ভীক বলদর্পী। এই সমস্ত যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের কথাই প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি ধার্মিকও ছিলেন। নিজে শিবের পূজা করতেন। লঙ্কায় যাগযজ্ঞ হত, বেদপাঠ হত। তাঁর নিজের পুত্র সপ্ত যজ্ঞ করে অনেক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তবু আমরা রামায়ণে রাবণকে অত্যাচারী রূপে চিহ্নিত দেখি। সে কি রামকে বড় করে দেখাবার জন্য? রাবণকে চরিত্রহীন অত্যাচারী না বললে কি রামের মহিমা অমোদের চোখে পড়ত না!



গুরুজী বললেন ঃ রামায়ণে আমরা রাবণের প্রথম উল্লেখ দেখি বালকাণ্ডে। বিশ্বামিত্র দশরথের নিকট এসে বললেন, মারীচ আর সুবাহু নামে দুই রাক্ষস তাঁর যজ্ঞে বিঘ্ন করছে, মাংস ও রক্ত বর্ষণ করছে যজ্ঞবেদীর উপর। শুনেছি, রাবণ নামে এক রাক্ষস ব্রহ্মার বরে পরাক্রান্ত হয়ে ত্রিলোক পীড়ন করছে। মারীচ আর সুবাহু তারই আজ্ঞাবহ। আমার যজ্ঞরক্ষার জন্য রামকে আমি চাই।

রাবণের নামে দশরথ ভয় পেয়ে বললেন, মানুষ দূরের কথা, রাবণের সামনে দাঁড়াতে পারে এমন কোন দেবতা বা দানবও নেই। যুদ্ধের সময় রাবণ বীরের বীর্য হরণ করে। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন, আমি সসৈন্যেও রাবণ বা তার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না।

ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র ফিরে যাচ্ছিলেন। তারপর বশিষ্ঠের কথায় দশরথ রাম লক্ষ্মণকে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। বশিষ্ঠ বলেছিলেন, মহারাজ, বিশ্বামিত্র রক্ষক হলে রামের কোনো ভয় নেই। তিনি নিজেই রাক্ষস দমনে সমর্থ। রামের মঙ্গলের জন্যই প্রার্থী হয়ে এসেছেন।

নিঃসন্তান সুকেতু যক্ষ পিতামহ ব্রহ্মাকে তপস্যায় তুষ্ট করে এক অপরূপ লাবণ্যময়ী কন্যা লাভ করেছিলেন। তারই নাম তাড়কা। তাডকার বিবাহ হয়েছিল জম্ভ নামে এক অসুরের পুত্র সুন্দের সঙ্গে। মারীচ নামে তাদের এক পুত্র হয়। কোন অপরাধের জন্য অগস্ত্য সুন্দকে বধ করেন। শোকার্তা তাড়কা প্রতিশোধ নেবার জন্য মারীচকে সঙ্গে নিয়ে অগস্ত্যকে আক্রমণ করেছিল। ঋষি তাদের শাপ দিয়েছিলেন। সেই শাপেই তাড়কা রাক্ষসী হল বিকৃত রূপা, আর মারীচও রাক্ষস হল।

গুরুজী বললেন ঃ ঋষির শাপে যারা রাক্ষস হয়েছে, তারা যদি ঋষিদের যজ্ঞ নষ্ট করে তা হলে কিছু বলার নেই। বরং রাক্ষসদের এই কার্য সমর্থনযোগ্য মনে হবে। প্রতিহিংসার বাসনা নেই কার? যার নেই, সে তো সাধারণ জীব নয়। ঋষি যদি তপস্বী হয়ে কারও অপরাধ ক্ষমা করতে না পারেন, তাহলে শাপগ্রস্ত হয়ে কি কেউ প্রতিহিংসার কথা ভাববে না, না তা ভাবলে তার অন্যায় হবে!

আমার মনে হল যে এই সব রাক্ষসের সঙ্গে রাবণের কোন যোগাযোগ ছিল না। রাবণের সঙ্গে তাডকার কোন সম্বন্ধ নেই, সম্বন্ধ ছিল না মারীচ ও সুবাহুর সঙ্গে। তারা সুন্দের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই ঋষিদের যজ্ঞ নষ্টের চেষ্টা করত। রাবণের আদেশে নিশ্চয়ই এ কাজ করত না। এমন আদেশ রাবণ কেন দেবেন! লঙ্কায় তাঁর নিজের পুত্রও তো যজ্ঞ করতেন! রাবণ নিজে কোন যজ্ঞ নষ্ট করেছেন বলে শোনা যায় নি।

গুরুজী বললেন: শোনা যায় যে রাবণরাও তাঁদের পিতা বিশ্রবা ঋষির কথায় রাক্ষস স্বভাব হয়েছিলেন। যজ্ঞে আহুতি দেবার সময় পত্নী কৈকসীর নিকট বাধা পেয়ে তিনি শাপ দিয়েছিলেন যে কৈকসী বিকৃত রূপ ক্রুর সন্তানের জননী হবেন। রামায়ণের বিরাধ রাক্ষস ছিল শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব। সঙ্গীতজ্ঞ তুম্বুরু কুবেরের শাপে রাক্ষস হয়েছিলেন। কবন্ধ দানবও মহর্ষি স্থূলশিরার শাপে রাক্ষস হয়েছিলেন। কাজেই এই রাক্ষসেরা যে ঋষি-বিদ্বেষী হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

তাউজী বললেন: আমার মনে একটা সংশয় আছে।

গুরুজী তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

তাউজী বললেন: রাবণ অত্যাচারী না হলে বিশ্বামিত্র দশরথকে সে কথা কেন বলবেন!

গুরুজী বললেন: বিশ্বামিত্র মিথ্যা কথা বলবেন না এ কথা সত্য। তিনি শোনা কথা বলেছেন, এবং হয়তো রাবণ সম্বন্ধে এই রকম কথা সাধারণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলে আমার কেন মনে হয়েছে তা বলি। বিশ্বামিত্র প্রথমে মারীচ ও সুবাহুর কথা বলেছিলেন। তাই শুনে দশরথ বলেছিলেন যে রামকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন ও তাকে ছেড়ে দিতে পারবেন না। কেন না তাঁর বয়স তখনও ষোল পূর্ণ হয় নি। তাঁর নিজের বয়স ষাট হাজার বছর হলেও তিনি সসৈন্যে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন। এই কথার উত্তরেই বিশ্বামিত্র বললেন যে তিনি রাবণের কথা শুনেছেন, মারীচ ও সুবাহু তাঁর আজ্ঞাবহ। বাল্মীকির নিজের রচনা হলে এ কথা তিনি প্রথমেই বলতেন, দশরথ আপত্তি করবার পরে বলতেন না।

অবশ্য যাঁরা রাবণের এই অত্যাচারের কথা বিশ্বাস করেন, তাঁদের অন্য যুক্তি আছে। তাঁরা সাধারণ ভাবে বিশ্বাস করেন যে রাক্ষসেরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তপস্যা করত, কিন্তু অন্যকে সে সুযোগ দিত না। অন্যে যাতে শক্তি বৃদ্ধি করতে না পারে তার জন্যই মুনিঋষিদের তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করত। আমার কাছে এ যুক্তি অসার বলে মনে হয়েছে।

গুরুজীর অনুমান সত্য বলে আমারও মনে হল। রাক্ষস হলেই অত্যাচারী ও বিকৃত রূপ হবে, এ কথা আমিও মানতে রাজী নই। স্বর্গের অপ্সরা এসে মুনিদের ধ্যান ভঙ্গ করতে পারত না, অথচ রাক্ষস কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবা বিবাহ করলেন। সেও তাঁর প্রথম বিবাহ নয়, তার আগেই তিনি ঋষি কন্যা দেববর্ণিনীকে বিবাহ করেছিলেন। ইন্দ্র বিবাহ করেছিলেন দৈত্যকন্যা শচীকে, রূপে মুগ্ধ হয়েই যে বিবাহ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। আবার মধু দৈত্য কোন দৈত্যের কন্যাকে পছন্দ না করে রাক্ষস কন্যা কুম্ভীনসীকে লঙ্কাপুরী থেকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। কুম্ভীনসীর রূপের খ্যাতি বোধহয় মধু দৈত্যকে এই দুঃসাহসের কাজে প্রেরণা যুগিয়েছে। গুরুজীর কথা আমি সহজেই মেনে নিলাম।

গুরুজী বললেন : স্ত্রীলোক বলে রাম তাড়কাকে বধ করতে চান নি। কিন্তু ব্রহ্মার বরে তাড়কার বল ছিল সহস্র হস্তীর সমান। রামের সঙ্গে তার প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। বিশ্বামিত্রের কথায় রাম তাকে বধ করেছিলেন। সুবাহুও নিহত হয়েছিল রামের হাতে, কিন্তু মারীচ বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। রামের বনবাস-কালে এই মারীচকে আমরা আবার দেখতে পাই।

তার আগে বিরাধ রাক্ষসের কাহিনী। বনবাসী রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে অগ্রসর হচ্ছেন। এমন সময় ভীষণ দর্শন বিরাধকে তাঁরা দেখতে পেলেন। বিরাধ ছুটে এসে সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে সরে গিয়ে বললেন, তপস্বীর বেশে একটি নারী নিয়ে তোমরা দুজনে পাপাচরণ করতে এসেছ! আমি তোমাদের রক্তপান করব, আর এই নারী আমার স্ত্রী হবে।

ভয়ে সীতা কাঁপতে লাগলেন। রাম অসহায় ভাবে লক্ষ্মণকে বললেন, আমার স্ত্রীর দুর্গতি দেখ, সে এখন রাক্ষসের কোলে, কৈকেয়ীর মনস্কামনা আজ পূর্ণ হয়েছে। নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষের কোলে দেখতে হল, এ যন্ত্রণা পিতার মৃত্যু ও রাজত্ব হারানোর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

লক্ষ্মণ সজল নয়নে বললেন, আপনার শক্তি তো কম নয়, আপনি অনাথের মতো শোক করছেন কেন! আমি এই রাক্ষসকে বধ করব।

বিরাধ হেসে বললেন, ব্রহ্মার বরে অস্ত্রাঘাত করে আমাকে কেউ মারতে পারবে না। তোমরা এই নারীর আশা ত্যাগ করে বিদায় হও।

রাম লক্ষ্মণ দুজনেই তাঁকে শরাঘাত করলেন। বিরাধ হেসে হাই তুলতেই সমস্ত শর তাঁর দেহ থেকে খসে পড়ল। তার পর সীতাকে নামিয়ে রেখে রাম লক্ষ্মণকে কাঁধে তুলে নিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সীতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হে রাক্ষসোত্তম, তোমাকে আমি নমস্কার করছি। রাম লক্ষ্মণকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ,

বাঘ ভালুক আমাকে খেয়ে ফেলবে। আমাকে নিয়ে তুমি ওদের ছেড়ে দাও।

সীতার এই কথা শুনে রাম লক্ষ্মণ বিরাধের বাহু দুটি ভেঙ্গে ফেললেন। রাক্ষস মূর্ছিত হয়ে পড়ল। রাম লক্ষ্মণ তাকে মাটি চাপা দিয়ে মারবার ব্যবস্থা করলেন।

তখন বিরাধ বললেন, আজ আমার মুক্তি হল, আমি তুম্বুরু গন্ধর্ব। অপ্সরা রম্ভার প্রতি আসক্তির জন্যে কর্তব্যে আমার ত্রুটি হয়েছিল, সময় মতো উপস্থিত হতে পারি নি বলে কুবের আমাকে শাপ দিয়েছিলেন। তাঁরই শাপে আমি রাক্ষস হয়ে আছি। আমার অনুতাপে তিনি শান্ত হয়ে বলেছিলেন যে রামের হাতে মৃত্যু হলেই আমার মুক্তি হবে। তোমরা আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দাও, রাক্ষসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এই বিধি। আর তোমরা এখান থেকে শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে যাও, তোমাদের মঙ্গল হবে।

গুরুজী বললেন ঃ এখানেও আমরা একই জিনিস দেখছি। কুবেরের শাপে গন্ধর্ব তুম্বুরুর রাক্ষস জন্ম হয়েছে। রাক্ষস দণ্ডকারণ্যে আরও ছিল। মুনি ঋষিরা রামকে বলেছিলেন, বাণপ্রস্থ নিয়ে অনেক ব্রাহ্মণ এই অরণ্যে এসে বাস করেন। রাক্ষসের হাতে তাঁরা নিহত হচ্ছেন। চিত্রকূটে পম্পা ও মন্দাকিনীর তীরে রাক্ষসের অত্যাচার আমরা আর সইতে পারছি না। তুমি আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা কর।

রাম এই এই অনুরোধ মেনে নিয়ে বললেন, রাক্ষসদের উপদ্রবের প্রতিকার করতে পারলে আমার বনবাস সার্থক হবে।

ঋষিদের নিকট বিদায় নিয়ে কিছু দূর চলবার পরে সীতা বললেন, ঋষিদের রক্ষার জন্য তুমি যে রাক্ষস বধের অঙ্গীকার করলে তার জন্যে আমার ভাবনা হচ্ছে। অস্ত্র শস্ত্রের সংস্পর্শে বুদ্ধি কদর্য ও মন কলুষিত হয়, এই তপোবনে আমাদের শুদ্ধ স্বভাবে ধর্মাচরণ করা উচিত।

অল্প দিন পরেই সীতার কথা সত্য বলে প্রমাণিত হল। রাম তখন পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করছেন। একদিন শূর্পণখা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। শূর্পণখার রূপের বর্ণনা আছে রামায়ণে। তাম্রকেশা লম্বোদরী বৃদ্ধা কুরূপা রাক্ষসী, কর্কশ কণ্ঠে রামকে বললেন, তোমার তপস্বী বেশ, কিন্তু ধনুর্বাণ হাতে স্ত্রীর সঙ্গে এই রাক্ষস সেবিত দেশে কেন এসেছ ?

রাম নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তুমি কে ? কেন এসেছ এখানে ?

শূর্পণখা নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি, তুমি আমাকে বিবাহ কর। এই কুৎসিত কৃশোদরী অসতী সীতা তোমার যোগ্য স্ত্রী নয়।

এই প্রস্তাব শুনে রাম হেসে বললেন, আমাকে বিবাহ করলে সপত্নীর সঙ্গে থাকা তোমার কষ্টকর হবে। হে বিশালাক্ষী, তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ভজনা কর। লক্ষ্মণ সচ্চরিত্র প্রিয়দর্শন ও অবিবাহিত, রূপে তোমারই তুল্য।

তাউজী যেন চমকে উঠলেন, বললেন : অবিবাহিত ?

গুরুজী হেসে বললেন : রহস্য করবার উদ্দেশ্যে রাম মিথ্যা কথা বলেছেন। আর শূর্পণখার প্রস্তাবের উত্তরে লক্ষ্মণ এ কথা অস্বীকার না করে বললেন, আমি আমার অগ্রজের দাস, তুমি দাসের স্ত্রী কেন হবে! তার চেয়ে তুমি রামেরই কনিষ্ঠা স্ত্রী হও। রাম ঐ বিরূপা করালদর্শনা অসতী বৃদ্ধাকে ত্যাগ করে তোমারই অনুরক্ত হবেন।

তাউজী প্রশ্ন করলেন : এই অসতী শব্দটি কেন বার বার ব্যবহৃত হয়েছে ? নিন্দার জন্য শূর্পণখার ব্যবহারে ক্ষতি নেই, লক্ষ্মণ কেন এমন কথা বললেন ?

গুরুজী বললেন : অসতী শব্দ বোধহয় বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হত না। তা হলে লক্ষ্মণ সে কথা পরিহাসচ্ছলেও উচ্চারণ করতেন না। শূর্পণখা এই পরিহাস বুঝতে পারেন নি। তাই বললেন, তুমি তোমার কুৎসিত স্ত্রীকে ত্যাগ করছ না, আমি তাকে খেয়ে ফেলছি। বলে সীতার দিকে অগ্রসর হলেন। রাম উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, এই অনার্যার সঙ্গে পরিহাস ভাল নয়, তুমি এই প্রমত্ত অসতীকে বিরূপ করে দাও।

রামের আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ খড়্গাঘাতে শূর্পণখার নাক ও কান কেটে দিলেন। রাক্ষসী শূর্পণখা রক্তাক্ত দেহে গর্জন করতে করতে অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গুরুজী বললেন : রামের বালি বধ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে, কিন্তু শূর্পণখার প্রতি তাঁর এই আচরণের কোন সমালোচনা হয় নি। রাক্ষসী তো কোন ঋষির যজ্ঞ নষ্ট করতে আসে নি, অত্যাচারও করে নি কারও উপরে। তবে কেন রাম তার নাসাকর্ণ ছেদন করতে বললেন। শূর্পণখার মা কৈকসী যখন এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্রবা মুনির নিকটে গিয়েছিলেন, তখন সেই মুনিও বিবাহিত ছিলেন। তবু তিনি রাক্ষসী কৈকসীকে বিবাহ করেছিলেন। দ্বাপরে হিড়িম্বা রাক্ষসী এসেছিলেন ভীমের নিকট, বিবাহিত ভীম তাঁকে প্রত্যাখান করেন নি। প্রেম প্রত্যাখান করলেও দোষ ছিল না, কিন্তু স্ত্রী জাতিকে অপমান করার কী প্রয়োজন ছিল! হোক অনার্যা, হোক কুরূপা, সে তো স্ত্রীলোক! বিধবা শূর্পণখাকে বিরূপা করে রাম যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

শূর্পণখা জনস্থানে গিয়ে তার মাসতুতো ভাই খরকে যুদ্ধে উত্তেজিত করলেন।

তাঁর পর চোদ্দ হাজার রাক্ষসের সঙ্গে রামের ঘোর যুদ্ধ হল। রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন সীতাকে নিয়ে গিরিগুহায় আশ্রয় নিতে। তার পর একা যুদ্ধ করেছিলেন। একে একে সকলে নিহত হল রামের হাতে, দূষণ ত্রিশিরা ও খর। একটি মাত্র রাক্ষস অকম্পন লঙ্কায় ছুটে গিয়েছিল রাবণকে সংবাদ দিতে। আর শূর্পণখাও গিয়েছিলেন রাবণের কাছে।

গুরুজী বললেন : এখানেও একটি ঘটনা আমার প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। রাবণ অকম্পনের কথায় জনস্থানে এসে ফিরে গিয়েছিলেন, তার পর দ্বিতীয় বার এসেছিলেন শূর্পণখার কথায়। আমার মনে হয়, রাবণ এক বারই এসেছিলেন। অকম্পনের কাছে রামের খবর পেয়ে রাবণ বলেছিলেন, রাম লক্ষ্মণকে শায়েস্তা করতে আমি যাচ্ছি। এ কথা শুনে অকম্পন বলেছিল, মহারাজ রামকে যুদ্ধে পরাজিত করে এমন শক্তি দেবাসুর বা আপনারও নেই। আপনি বরং তার সুন্দরী স্ত্রীকে হরণ করুন, রাম তারই বিরহে মরে যাবে। রামের কাছে রাবণ পরাজিত হবে, এমন কথা মুখের উপর কেউ বলতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কেউ বললে রাবণ প্রথমেই তাকে বিনাশ করতেন। কিন্তু এই কয়েকটি শ্লোকে আমরা অন্য জিনিস দেখলাম। রাবণ বললেন, আমি তাই করব তারপর রথে আরোহণ করে মারীচের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। রাবণের অভিপ্রায় জেনে মারীচ তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করল। মারীচ বলল, আপনার কোন শত্রু এই পরামর্শ দিয়েছে। সীতা হরণের চেষ্টা আপনি করবেন না। মারীচের পরামর্শে রাবণ লঙ্কায় ফিরে গেলেন। এই কাহিনীটি আমার কাছে মিথ্যা মনে হয়েছে। বলদর্পিত রাবণ সাধারণ রাক্ষসের কথায় নিজের কর্তব্য স্থির করবেন, এ যেন রাবণের চরিত্র বিরুদ্ধ কথা। রাবণের মতো অহঙ্কারী বীর তো সে যুগে দ্বিতীয় ছিল না।

শূর্পণখা যখন লঙ্কায় পৌঁছলেন, রাবণ তখন সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর বিশাল বক্ষ, বৃহৎ বদনে শুক্ল দশন, বৈদূর্যের মতো শ্যাম কান্তি, সুদৃশ্য বসনভূষণে সজ্জিত। তাঁর দেহে নানা অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তিনি তাঁর সচিবগণে বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। এইখানে রাবণের বিক্রমের বর্ণনায় আমরা একটি নূতন সংবাদ পাই। তিনি ভোগবতী পুরীতে গিয়ে বাসুকিকে পরাস্ত করে তক্ষকের ভার্যাকে হরণ করেছিলেন। তিনি ক্রূরকর্মা কঠিন নির্দয় বলে সর্ব লোক তাঁকে ভয় করে। কিন্তু শূর্পণখা তাঁকে ভয় পান না। সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে র্ভৎসনা করলেন, তুমি নির্বোধ বালস্বভাব, তাই ভোগে মত্ত হয়ে আছ। তোমার চর নেই, তোমার সচিবরা মূর্খ, তাই নিজের বিপদ সম্বন্ধে তুমি এখনও অজ্ঞ আছ। কী করে তুমি রাজত্ব চালাবে আমি জানি না!

এ সব কথার উত্তর না দিয়ে রাবণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে তোমাকে বিরূপ করেছে? কিন্তু রাবণের প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় শূর্পণখা মিথ্যা কথা বললেন, দণ্ডকারণ্যে এখন রামের সঙ্গে আছে তার স্ত্রী সীতা, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, পূর্ণচন্দ্রাননা সুকেশী ও বিশালাক্ষী। তার মতো সুন্দরী নারী আমি দেব গন্ধর্ব যক্ষ ও কিন্নরের মধ্যেও দেখি নি। সীতাকে আমি তোমারই যোগ্য মনে করে আমি তাকে আনতে চেষ্টা করেছিলাম। রামের ভাই লক্ষ্মণ আমাকে এই জন্যেই বিরূপ করে নিয়েছে। সীতাকে যদি পেতে চাও তো এখনই দণ্ডকারণ্যে যাত্রা কর।

গুরুজী বললেন: শূর্পণখার এই মিথ্যা ভাষণের কারণ খুবই স্পষ্ট। নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে হলে রাবণকে উত্তেজিত করতে হবে। সত্য কথা বললে কার্যসিদ্ধি নাও হতে পারে। শূর্পণখা মনে করেছিলেন যে সীতা হরণের প্রলোভনেই রাবণ অসাধ্য সাধন করতে পারেন। কিন্তু কেন এ কথা মনে করেছিলেন তাও ভেবে দেখা দরকার। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে যে বড় ভাই-এর চরিত্রের দুর্বলতা ছোট বোনের জানা ছিল। এবং ভেবেছিলেন যে এর চেয়ে বড় প্রলোভন তাঁর কাছে আর কিছু নেই। কিন্তু আমার অন্য কথা মনে হয়েছে। শূর্পণখা রামের শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। খর দূষণ ও চোদ্দহাজার রাক্ষসের মৃত্যু দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সম্মুখ সমরে রাবণ হয়তো রামকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করতে পারবেন না। তাই তিনি সীতা হরণের যুক্তি দিয়েছিলেন। তাতে শুধু সীতাকে নয় রামকেও শাস্তি দেওয়া হবে। অকম্পন রাবণকে এই কথা আরও স্পষ্ট ভাবে বলেছিল। রামকে কাবু করা তো সহজ কাজ নয়, সীতার বিরহেই রাম কাবু হবেন। সীতা হরণে রাবণ রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু কেন রামের সঙ্গে যুদ্ধ না করে ছলনায় সীতা হরণ করলেন, সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠতে পারে। হয়তো ভেবেছিলেন যে রাম যখন তাঁর ভগিনীকে বিরূপ করেছিলেন তখন সীতাকে হরণ করলেই এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। সীতাকে পাবার জন্য সীতা হরণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। সীতা লক্ষ্য নয়, সীতা উপলক্ষ্য।

মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাবণ গোপনে রথ তৈরি করতে বললেন। গোপনে কেন তা পরিষ্কার করে বলা নেই। চোরের মত নারী হরণ অপযশের কথা বলেই বোধহয় গোপনে এই ব্যবস্থা করেছিলেন। রথে চড়ে রাবণ সমুদ্র তীরে এলেন। সেখানে ঋষিরা তপস্যা করেন, আর অপ্সরা ও দেবপত্নীরা ক্রীড়া করেন। রাবণ সমুদ্র পার হয়ে মারীচের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

গুরুজী বললেন: এখানেও আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করছি। লঙ্কার সমুদ্র তীরে ঋষিরা তপস্যা করেন এবং অপ্সরা ও দেব পত্নীরাও নিঃশঙ্ক চিত্তে ক্রীড়া

করেন। রাবণ অত্যাচারী হলে এ চিত্র আমরা দেখতাম না। রাক্ষস সেবিত লঙ্কায় যখন ঋষিরা তপস্যা করেন নির্বিঘ্নে, তখন ভারতের অন্য প্রান্তে রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞায় ঋষিদের যজ্ঞ নষ্ট করত বলে মনে করা উচিত নয়। রাক্ষসেরা স্বধর্মেই যজ্ঞ নষ্ট করত, কারও আজ্ঞায় তা করত বলে মনে হয় না।

রাবণ মারীচকে বললেন, বৎস, তুমি মায়া জান, জনস্থানও জান। আমি তোমার সাহায্য চাই। রাম আমার ভাই খর দূষণ ও চৌদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করেছে। নাক কান কেটে দিয়েছে শূর্পণখার। তুমি স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে রাম লক্ষ্মণকে দূরে নিয়ে যেও, আমি সীতাকে হরণ করব। পত্নীর বিরহে রাম কৃশ হয়ে গেলে আমি তাকে অনায়াসে বধ করব।

গুরুজী বললেন : রাবণের এই কথা শুনে মনে হচ্ছে তিনি রামকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করতে চান নি, কৌশলে তাঁকে বধ করতে চেয়েছেন। সীতা হরণের উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে রামের শক্তিক্ষয়ের চেষ্টা। কিন্তু মারীচ এই প্রস্তাব শুনে ভয় পেয়েছিল। এক দিকে রাক্ষসরাজ রাবণ তার সাহায্যপ্রার্থী, অন্য দিকে মহেন্দ্র ও বরুণতুল্য মহাবীর্যবান রাম। মারীচ কৃতাঞ্জলি হয়ে সভয়ে বলল, সতত প্রিয়বাদী পুরুষ জগতে সুলভ, কিন্তু দুর্লভ হল অপ্রিয় ও হিতবাক্যের বক্তা ও শ্রোতা। অপ্রিয় হলেও আপনার হিতের জন্য একটি সত্য কথা বলা দরকার। আপনার চর নেই এবং আপনি চপল স্বভাবের, এই জন্যেই রামের পরাক্রমের সংবাদ এখনও পর্যন্ত পান নি। সীতা হরণ করলে আপনার নিয়তি নিকটে আসবে।

তারপর মারীচ তার পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করল। সব শুনে রাবণ বললেন, আমি তোমার কাছে পরামর্শ চাইতে আসি নি, আমি একটা সংকল্প নিয়ে তোমার সাহায্য চাইছি।

আমার কথা শুনলে আমি তোমাকে অর্ধ রাজ্য দেব, আর না শুনলে আজই তোমাকে বধ করব।

মারীচ এবারে নির্ভয়ে বলল, আমাকে যে মরতে হবে তা আমি বুঝতেই পারছি, তার জন্য ভয় পাই নে। রামের হাতেই আমি মরব। কিন্তু যে পাপীরা আপনাকে সীতাহরণের পরামর্শ দিয়েছে, তারা আপনাকেও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই পাপে আপনার রাজ্য কুল সবই নষ্ট হবে। আমার কথা যদি না মানেন তবে চলুন।

রাবণ খুশী হয়ে বললেন, এইবারে তোমাকে বীর মারীচ বলে মনে হচ্ছে। এস আমার বিমানে।

তারপর তাঁরা বিমানে চড়ে অনেক বন ও পর্বত পেরিয়ে দণ্ডকারণ্যে রামের

আশ্রমের নিকটে এসে অবতরণ করলেন। মারীচ মায়া বলে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে সীতাকে প্রলুব্ধ করতে গেল। সীতা পুষ্পচয়ন করছিলেন, সেই সোনার হরিণ দেখে রাম লক্ষ্মণকে ডেকে দেখালেন। তারপর আবদার ধরলেন সেই হরিণটি ধরে দেবার জন্য। রাম লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি সীতার সঙ্গে আশ্রমে থাক, আমি মৃগটি ধরে আনি।

লক্ষ্মণ বললেন, আমার মনে হয় ওটি মায়া মৃগ,আমাদের সর্তক হওয়া দরকার।

রাম বললেন, তাহলে তো তাকে বধ করাই উচিত। তুমি সতর্ক হয়ে সীতাকে দেখ।

সেই মায়া মৃগ রামকে ভুলিয়ে অনেক দূরে নিয়ে গেল। রাম যখন বুঝলেন যে তাকে ধরা যাবে না, তখন তীর দিয়ে তাকে বধ করলেন। মরবার আগে মারীচ হা রাম হা সীতা বলে রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে আর্তনাদ করলে।

এই আর্তনাদ শুনে সীতা বিচলিত হলেন। লক্ষ্মণকে অনুরোধ করলেন রামের কাছে যাবার জন্য। কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁকে ছেড়ে যেতে আপত্তি করে অনেক কটূক্তি শুনলেন। তারপর বাধ্য হলেন সীতাকে একা ফেলে যেতে। ঠিক এই সময়েই পরিব্রাজকের রূপ ধরে রাবণ এসে সীতার সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর পায়ে পাদুকা, হাতে ছত্র ও যষ্ঠি কমণ্ডলু, মাথায় শিখা ও পরণে কাষায় বস্ত্র।

গুরুজী বললেন : রাবণের বর্ণনা দেখে বোঝা যায় যে দশানন রাবণ প্রথমে তাঁর নিজ রূপে আসেন নি। প্রাথমিক কথোপকথনের পরে তিনি নিজ রূপ ধারণ করেছিলেন। তার আগে সীতাকে সম্ভাষণ করে যা বলেছিলেন এ যুগের বিচারে তা নিতান্তই অশ্লীল। বেদ বাক্য উচ্চারণ করে তিনি সীতার দেহের সৌন্দর্য বর্ণনা করলেন মুগ্ধ হৃদয়ে, তারপর প্রশ্ন করলেন, তুমি কে, কার স্ত্রী, কেন এই রাক্ষস সেবিত দণ্ডক বনে একাকী বাস করছ ?

সীতা তাঁর রূপের নগ্ন বর্ণনায় লজ্জিত হন নি, কোন প্রতিবাদও করেন নি। অতিথিকে ব্রাহ্মণ মনে করে আসন ও পাদ্য দিলেন, তার পর সৎকারের জন্য ভোজ্য বস্তু দিয়ে প্রথমে রাবণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, পরে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। রাবণ বললেন, দেবাসুর ও মানুষ যার ভয়ে ভীত আমি সেই রাবণ। আমার প্রধান মহিষী হবার অনুরোধ নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমার সঙ্গে লঙ্কায় চল, তোমার কোন সাধ অপূর্ণ থাকবে না।

সীতা তাঁকে অকথ্য কটূক্তি করেছিলেন। আর রাবণ তাঁকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে সীতাকে অনুতাপ করতে হবে। সীতাও রাবণকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে রামের ভার্যাকে হরণ করলে তাঁকেও

পস্তাতে হবে।

এই কথা শুনেই রাবণ নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। সেই দশ মুণ্ড বিশ হাত বিরাট দেহ। বললেন, অল্পায়ু মানুষের প্রতি তোমার অনুরাগ কেন, তুমি আমাকে ভজনা কর। বলে বাম হাতে সীতার কেশ ও ডান হাতে দুই উরু ধরে সীতাকে ক্রোড়ে নিয়ে রথে তুললেন, রথ আকাশে উঠল। মুক্তি পাবার জন্য সীতা প্রথমে ছটফট কবেছিলেন, তারপর বিলাপ করেছিলেন, চীৎকার করে বলেছিলেন রাম লক্ষ্মণকে খবর দেবার জন্য। ষাট হাজার বৎসরের বৃদ্ধ গৃধ্ররাজ জটায়ু যুদ্ধ করে প্রাণ হারালেন। রাবণ সীতাকে নিয়ে লঙ্কায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে অন্তঃপুরে রেখে রাক্ষসীদের বললেন, ইনি যা চাইবেন, বসনভূষণ মণিমুক্তা, সবই দেবে। কেউ একে অজ্ঞাতসারেও অপ্রিয় বাক্য বললে আমি তাকে বধ করব। আর একটা কথা, আমার আদেশ ছাড়া কোন স্ত্রী পুরুষ সীতাকে দেখতে পাবে না।

তারপর আটজন রাক্ষসকে বললেন, তোমরা গোপনে জনস্থানে যাও। সেখানে সশস্ত্র হয়ে থাকবে ও রামের সকল সংবাদ আমাকে জানাবে।

গুরুজী বললেন: রাবণ সীতাকে যে অন্তঃপুরে রেখেছিলেন তা তাঁর প্রাসাদের ভিতর নয়। কারণ আমরা কিছু পরেই দেখতে পাই যে তিনি সীতাকে তাঁর প্রাসাদ দেখাবার জন্য নিয়ে এলেন। প্রাসাদের স্তম্ভগুলি স্বর্ণ রৌপ্য স্ফটিক গজদন্ত নির্মিত হীরক ও বৈদূর্য খচিত। গবাক্ষে সুবর্ণের জালি, স্বর্ণময় সোপান। এই প্রাসাদে তাঁর এক সহস্র স্ত্রী। তাঁর ঐশ্বর্য দেখাতে দেখাতে রাবণ বললেন, এই শত যোজন বিস্তৃত লঙ্কা সমুদ্র বেষ্টিত, সুরাসুরের অজেয়। বত্রিশ কোটি রাক্ষসের আমি রাজা। রাজ্যভ্রষ্ট অল্পায়ু রামকে পরিত্যাগ করে আমাকে গ্রহণ করলে সমস্ত রাক্ষস ও দেবতারাও তোমার সেবক হবে। বনবাসে তোমার কৃত পাপের ক্ষয় হয়ে গেছে, এখন তোমার পুণ্য ফল ভোগের সময়।

বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢেকে সীতা কাঁদছিলেন। তাই দেখে রাবণ বললেন, আর লজ্জা কেন সীতা, আমাদের মিলন হবে ধর্ম বিহিত। আমি দাস তোমার পায়ে মাথা রাখছি, তুমি প্রসন্ন হও।

সীতা নির্ভয়ে বললেন, রাক্ষস, এ তোমার দুরাশা। রামের সঙ্গে শত্রুতা করে তুমি রক্ষা পাবে না।

এ কথার উত্তরে রাবণ সীতাকে ভয় দেখাবার জন্য বললেন, বেশ, তোমাকে আমি বার মাস সময় দিয়ে গেলাম। এর মধ্যে তুমি আমার অনুগত না হলে আমার প্রাতরাশের জন্য পাচক তোমাকে কাটবে। তারপর রাক্ষসীদের বললেন,

তোমরা সীতাকে গোপনে রক্ষা কর, আর ভাল মন্দ কথায় তাকে বশে আনবার চেষ্টা কর।

গুরুজী বললেন : সীতার উপরে রাবণ কোন অত্যাচার করেন নি, অন্যকেও অত্যাচার করতে দেন নি। দীর্ঘ দিন পরে আর একবার তিনি সীতার কাছে এসেছিলেন। ষডঙ্গবেদবিৎ ব্রহ্ম রাক্ষসদের বেদধ্বনি শুনে যখন তাঁর ঘুম ভাঙল, তখন তিনি সীতাকে দেখবার জন্য অশোক বনের দিকে চললেন। তাঁর স্ত্রী ও অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরা তাঁর সঙ্গে চলল রাজছত্র আসন স্বর্ণভৃঙ্গার ও সুরাপাত্র নিয়ে। অঙ্গে তাঁর শুভ্র সুরভিত বস্ত্র, চক্ষু আরক্ত, সুরায় বিহ্বল তিনি। রাবণকে আসতে দেখে সীতা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। রাবণ বললেন, দেবী, তুমি আমাকে ভয় পেও না। তোমার অনিচ্ছায় আমি তোমাকে স্পর্শ করব না। বিশ্বাস করে আমাকে গ্রহণ কর, তোমার সুখের আর সীমা থাকবে না।

সীতা দুজনের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ একটি তৃণ রেখে রাবণকে কঠিন ভাষায় ভৎর্সনা করলেন। শুধু শাস্ত্রের কথা শোনালেন না, ভয়ও দেখালেন তাঁকে। তাঁর উত্তরে রাবণ শান্ত ভাবে বললেন, পুরুষের মনোরঞ্জনেই রমণী তার বশে আসে, কিন্তু আমার প্রিয় কথার উত্তরে তুমি আমাকে তিরস্কার করছ। কামনা থেকে স্নেহের জন্ম, আর এই স্নেহ ক্রোধকে দমন করে। আমি তাই তোমার কঠোর কথার উত্তরে আরও দু মাস সময় দিয়ে যাচ্ছি। বলে সীতাকে শীঘ্র বশে আনবার জন্য রাক্ষসীদের আদেশ দিয়ে রাবণ ফিরে গেলেন।

হনুমান এই সময়ে অশোক বনে ছিলেন। সীতার সাক্ষাৎ পাবার পর রাক্ষসদের বল পরীক্ষার চেষ্টা করলেন। অসংখ্য রাক্ষসকে যুদ্ধে বধ করলেন। তাঁর হাতে পাঁচজন সেনাপতি, প্রহস্তের পুত্র জম্বুমালি ও রাবণের পুত্র যক্ষ নিহত হন। রাবণ তখন মেঘনাদকে পাঠালেন। মেঘনাদ হনুমানকে বন্ধন করলেন। রাক্ষসেরা তাঁকে রাজসভায় নিয়ে এল।

হনুমান রাবণকে দেখলেন। নীলাঞ্জন বর্ণ দেহ রক্তচন্দনে চর্চিত, পরিধানে ক্ষৌম বসন, বাহুতে কেয়ুর, গলায় রত্নহার, দশ মস্তকে মুক্তার মুকুট। স্ফটিকের আসনে তিনি উপবিষ্ট, প্রমদারা চামর হাতে দণ্ডায়মান। রাবণের রূপ দেখে হনুমান মুগ্ধ হলেন, মনে মনে ভাবলেন, কী শক্তি কী দ্যুতি কী ধৈর্য! অধর্ম প্রবল না হলে ইনি সুরলোকের রক্ষক হতেন। রাবণও হনুমানকে দেখে শিবের অনুচর নন্দী কিংবা অসুররাজ বাণ বলে মনে করেছিলেন।

গুরুজী বললেন : বাণ বলির পুত্র। রাবণ বলিকে দেখেছিলেন পাতালে।

আর বাণের রাজধানী ছিল শোণিতপুরে, বর্তমান আসামের তেজপুরে। দ্বাপরে মহাভারতের যুগে আমরা বাণের কন্যা উষার কাহিনী পাব। রাবণ ও হনুমান সাক্ষাতে আমরা দেখতে পাই যে হনুমান রাবণকে বলছেন, তুমি ধর্মজ্ঞ, তপস্যাতেও সিদ্ধিলাভ করেছ। তোমার মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তির ধর্ম বিরুদ্ধ কর্মে প্রবৃত্তি থাকা উচিত নয়। পরস্ত্রীকে অবরুদ্ধ না রেখে সীতাকে তুমি রামের হাতে সমর্পণ কর।

হনুমান যে দুষ্কর্ম করেছিলেন তার জন্য রাবণ তাঁকে বধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দূত অবধ্য, বিভীষণ তাঁকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে তিনি হনুমানের লেজ আগুনে দগ্ধ করবার আদেশ দিলেন। হনুমানের লঙ্কাদাহের কাহিনী আমাদের সকলেরই জানা আছে।

গুরুজী একটু থেমে বললেন : তারপর যুদ্ধ কাণ্ড।

সমুদ্রের অপর পারে বানর সেনা এসে পৌঁছে গেছে জেনে রাবণ তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে বসলেন। একটা বানর এসে লঙ্কা দাহ করে গেছে বলে তিনি লজ্জিত ছিলেন। মন্ত্রীরা যুদ্ধ করাই স্থির করলেন, কিন্তু আপত্তি করলেন শুধু বিভীষণ। তিনি বললেন, সীতাকে রামের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত, তা না হলে এই লঙ্কাপুরী ও রাক্ষসেরা রক্ষা পাবে না। বিভীষণ রাবণের বাসভবনে গিয়েও এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। রাবণ এক মত না হলেও আত্মীয়-স্বজনের নিকট আপন সম্মানের হানিতে সীতার চিন্তায় ও পাপের গ্লানিতে মানসিক কষ্ট পেতে লাগলেন। আবার তিনি রাজ সভায় রাক্ষস বীরদের আহ্বান করলেন। বললেন, তোমাদের যত্নেই আমার এই সমৃদ্ধি, এখনও আমি তোমাদের সাহায্য প্রার্থী। দণ্ডকারণ্য থেকে আমি সীতাকে হরণ করে এনেছি, কিন্তু সেই অলস-গামিনী এখনও আমাকে ধরা দেন নি। রামের প্রতীক্ষায় তিনি এক বৎসর সময় চেয়েছিলেন, আমি তাঁকে সেই সময় দিয়েছি। সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়া চলে না, রাম লক্ষ্মণকে কী ভাবে বধ করা যায় সেই মন্ত্রণা কর।

ছ মাস নিদ্রার পরে জাগ্রত হয়ে কুম্ভকর্ণ সভায় এসেছিলেন, বললেন, মহারাজ, তুমি তোমার অযোগ্য ও অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছ। আমাদের সঙ্গে আগে পরামর্শ করলে আমরা তোমাকে বাধা দিতাম। কিন্তু এখন আর এ কথা বলে লাভ নেই। এখন আমরা তোমাকে সাহায্য করব।

মহাপার্শ্ব নামে এক রাক্ষস রাবণকে তাঁর কামনা চরিতার্থের পরামর্শ দিল। রাবণ এই পরামর্শের প্রশংসা করে বললেন যে তার উপায় নেই। একবার পুঞ্জিক-স্থলা অপ্সরাকে বিবসনা করবার জন্য ব্রহ্মা তাঁকে শাপ দিয়েছিলেন। সেই অপ্সরা আকাশ পথে ব্রহ্মার কাছে যাচ্ছিল, রাবণের নামে নালিশ করেছিল পিতামহের

কাছে। তিনি শাপ দিয়েছিলেন যে নারীর উপরে বলপূর্বক অত্যাচার করলে তার মাথা শতধা বিদীর্ণ হবে।

গুরুজী বললেন : রাজ সভায় রাবণ সকলের সামনে এই শাপের কথা বললেন। অনেক আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তাঁর মামা আছেন, দুই ভাই আছে এবং পুত্রও আছে। এঁদের সামনে রাবণ নিজের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা পেলেন না।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা মনে পড়ল। গুরুজী বলেছিলেন যে একবার অপ্সরা রম্ভাকে সবলে গ্রহণ করবার জন্য নলকুবের রাবণকে শাপ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা যে শাপ দিয়েছিলেন, সেই একই শাপ। দুটো ঘটনাই তাই সত্য হওয়া সম্ভব নয়। একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা। কিংবা রম্ভা ও পুঞ্জিকস্থলার নিগ্রহের ব্যাপারই ভিন্ন রকমের। এই প্রসঙ্গে বেদবতীর কথাও আমার মনে পড়ল।

গুরুজী বললেন : এই সভাতেও বিভীষণ রাবণকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, এখনও সময় আছে। এখনও সীতাকে রামের হাতে প্রত্যর্পণ কর। কিন্তু বিভীষণের পরামর্শ কেউই সমর্থন করলেন না, পরন্তু রাবণ তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, তুমি কুলাঙ্গার, ধিক তোমাকে। পাশ আগুন বা অস্ত্র শস্ত্র আমাদের কাছে ভয়ের নয়। স্বার্থপর জ্ঞাতিরাই ভয়াবহ।—

নাগ্নির্নান্যনি শস্ত্রাণি নঃ পাশা ভয়াবহাঃ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তঃ জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ॥

বিভীষণ এই তিরস্কার শুনে বললেন, তোমার মঙ্গলের জন্য আমি যা বলেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। তোমার মঙ্গল হোক, তুমি সুখী হও। আমি চললাম। বলে বিভীষণ সমুদ্র পার হয়ে রামের সঙ্গে মিলিত হলেন।

শার্দূল নামে রাবণের এক চর তাঁকে রামের সেনাবাহিনীর সংবাদ দিলে রাবণ শুক নামে এক মন্ত্রীকে সুগ্রীবের নিকট পাঠালেন। উদ্দেশ্য ভেদসৃষ্টি। সুগ্রীবকে তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শুক পক্ষীর রূপ ধারণ করে সুগ্রীবের কাছে এসেছিল, আর বানরদের হাতে তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না।

এর পরে সেতু বন্ধন করে রাম সসৈন্যে লঙ্কায় উপস্থিত হলেন। রাবণ আবার শুক ও সারণকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠালেন। তারা বানরের রূপ ধারণ করে এসেছিল, কিন্তু বিভীষণের হাতে ধরা পড়ে গেল।

গুরুজী বললেন : এইখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। বানর যদি এ যুগের বানরের মতো হত, তাহলে বিভীষণ বানর রূপী শুক সারণকে কিছুতেই চিনতে পারতেন

না। নিশ্চয়ই তারা নিজ রূপেই এসেছিল, আর তাদের পরিধানে ছিল বানরের ছদ্মবেশ। রাম তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন।

ফিরে গিয়ে শুক সারণ রাবণকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিল। বলেছিল, রামের সঙ্গে যুদ্ধ না করে সীতাকে আপনি ফিরিয়ে দিন। কিন্তু রাবণ এই উপদেশের জন্য তাদের ভৎর্সনা করেছিলেন। অন্য চর পাঠিয়েছিলেন রামের কাছে, তারাও ধরা পড়েছিল, আর মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছিল।

গুরুজী বললেন : সীতা হরণের মতো রাবণের আর একটি কাজের নিন্দা আমরা করতে পারি। তিনি বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে একজন মায়াবী রাক্ষসকে দিয়ে মায়া বলে রামের মুণ্ড ও ধনুর্বাণ নির্মাণ করালেন। তারপর সীতার কাছে গিয়ে মিথ্যা কথা সবিস্তারে বললেন।--রাত্রি কালে রামের শিবির আক্রমণ করে তাঁর সেনাপতিরা শত্রুসৈন্য ধ্বংস করেছে এবং রামকেও বধ করেছে। তারপর বিদ্যুজ্জিহ্বকে রামের মুণ্ড ও ধনুর্বাণ আনবার জন্য আদেশ করলেন। রামের ছিন্ন মুণ্ড দেখে সীতা শোকে আকুল হলেন। এমন সময় দ্বারপাল এসে রাবণকে ডেকে নিয়ে গেল।

বিভীষণের স্ত্রী সরমা রাবণের আদেশে সীতার কাছে থাকতেন। সীতাকে সরমা ভালবেসেছিলেন। রাবণ চলে যেতেই সামনে এসে বললেন, তুমি ভয় পেও না, রাবণ নিশ্চয়ই সত্য কথা বলেন নি। বলে থাকলে সেনাপতিদের ও অমাত্যদের আহ্বানে এমন করে ছুটে যেতেন না। তারপরে সংবাদ সংগ্রহ করে এসে বললেন যে রাবণের মা ও বৃদ্ধ মন্ত্রীরা তোমাকে রামের হাতে প্রত্যর্পণের পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু রাবণ যুদ্ধের জন্য বদ্ধপরিকর।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে আরও একবার মন্ত্রণা সভা বসেছিল। তাতে রাবণের মাতামহ মাল্যবানও যুদ্ধ করতে বারণ করেছিলেন, বলেছিলেন, তুমি অধর্ম আশ্রয় করেছ বলেই তোমার শত্রুরা প্রবল হয়েছে। আমি নানা রূপ অশুভ লক্ষণ দেখছি। তাইতেই বলছি, সীতাকে তুমি ফিরিয়ে দাও। রাবণ তাঁর কথা মানলেন না বলে লজ্জিত হয়ে তিনি নিজের ভবনে ফিরে গেলেন।

তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হল। সুগ্রীবের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ, রাম ও রাবণ সেনার যুদ্ধ। ইন্দ্রজিতের নাগপাশে রাম লক্ষ্মণ অচেতন হয়ে গেলেন। রাবণ সীতাকে পুষ্পক রথে পাঠিয়ে এই দৃশ্য দেখিয়ে আনলেন। রথে রাক্ষসী ত্রিজটা ছিল। সে বলল, তুমি ভয় পেও না, রাম লক্ষ্মণকে অচেতন মনে হচ্ছে। সীতা ফিরে গেলেন। গরুড় এসে নাগপাশ থেকে রাম লক্ষ্মণকে রক্ষা করলেন।

একে একে ধূম্রাক্ষ বজ্রদংষ্ট্র অকম্পন ও প্রহস্ত নিহত হল। তখন রাবণ স্বয়ং এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। বীরবিক্রমে যুদ্ধ করলেন সুগ্রীব হনুমান লক্ষ্মণ ও রামের সঙ্গে,

সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকে পরাজিত করলেন, আর নিজে পরাজিত হলেন রামের কাছে। রাম বললেন, তুমি রণ ক্লান্ত, তোমাকে আমি বধ করব না, বিশ্রাম করে আবার যুদ্ধ করতে এসো।

এই যুদ্ধের পরে রাবণ বুঝেছিলেন যে এবারে তাঁর মৃত্যু আসন্ন। লঙ্কাপুরীতে ফিরে সভাসদদের বলেছিলেন, ব্রহ্মার বরে আমি সকলের অজেয়, ভয় শুধু মানুষকে। অনরণ্যও আমাকে শাপ দিয়েছিলেন যে তাঁর বংশের একজন বীরের হাতে আমি সবংশে নিহত হব। অনরণ্যের বংশেই রাম জন্মগ্রহণ করেছেন। তারপর বেদবতীর অভিশাপ, সীতা রূপে তিনিই বোধহয় জন্মগ্রহণ করেছেন। একে একে রাবণ অন্য সব শাপের কথাও স্মরণ করলেন—উমা নন্দীশ্বর অপ্সরা রম্ভা ও বরুণ কন্যা পুঞ্জিকস্থলা। ঋষিদের কথাও তাঁর মনে পড়ল। তিনি এবারে কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে পাঠাবেন বলে স্থির করলেন।

কুম্ভকর্ণ তখন তাঁর যোজন বিস্তৃত রমণীয় গুহায় সুখে নিদ্রামগ্ন। ছ মাস পরে এক দিনের জন্য তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়। রাক্ষসেরা রাবণের আদেশে তাঁকে জাগাবার জন্য যে বিপুল আয়োজন করেছিলেন, রামায়ণে আমরা তা পড়েছি। অস্ত্রের আঘাতে বা বাদ্যভাণ্ডে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয় নি, তাঁর দেহের উপর সহস্র হস্তী ধাবিত হবার সুখ স্পর্শে তিনি জেগেছিলেন। প্রচুর মাংস ও দু হাজার কলস মদ খেয়ে ঈষৎ মত্ত হয়ে তিনি রাবণের কাছে এলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বললেন, শত্রুকে অবজ্ঞা করে যে রাজা আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় বিমুখ, অনর্থ তাঁর ঘটবেই। মন্দোদরী ও বিভীষণের কথা শুনলে আমাদের অমঙ্গল হত না। তারপর রামের সেনার সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করে রামের হাতে তিনি নিহত হলেন।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শোকে রাবণ মূর্ছিত হয়েছিলেন। তারপর সংজ্ঞা লাভ করে বলেছিলেন, তোমাকে হারিয়ে রাজ্যে ও জীবনে আমার কী প্রয়োজন, সীতাকে নিয়েই বা আমি কী করব!

একে একে অনেক রাক্ষস নিহত হল—নরান্তক দেবান্তক মহোদর ত্রিশিরা মহাপার্শ্ব ও অতিকায়। তারপর ইন্দ্রজিৎ আবার এলেন যুদ্ধ করতে এবং অস্ত্রজালে রাম লক্ষ্মণকে অভিভূত করে ফিরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে সুগ্রীব নীল অঙ্গদও মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। আর অসংখ্য বানর নিহত হয়েছিল। আহত জাম্ববান হনুমানকে হিমালয় পর্বত থেকে মৃতসঞ্জীবনী বিশল্যকরণী সাবর্ণকরণী ও সন্ধানী এই চার মহৌষধি আনবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। হনুমান এ সব খুঁজে না পেয়ে ওষধি পর্বতটিই উৎপাটিত করে নিয়ে এলেন। সেই ওষধির গন্ধে সকলে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

গুরুজী বললেন : মৃত রাক্ষসদের কথাও আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের একটিও মৃত দেহ ছিল না। রাবণের আদেশে মৃত রাক্ষসদের সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হত। কাজেই একজন রাক্ষসও এই ওষধির গুণে বেঁচে উঠল না।

নূতন উদ্যমে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। সূর্যাস্তের পরে বানরসেনা লঙ্কা আক্রমণ করল। এই যুদ্ধে কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ নিকুম্ভ ও আরও অনেক রাক্ষস বীর নিহত হল। তারপর তৃতীয়বার ইন্দ্রজিৎ এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। এবারে হনুমান সবিস্ময়ে দেখলেন যে তাঁর রথে সীতা, এবং ইন্দ্রজিৎ সীতাকে প্রহার করে খড়্গের আঘাতে কেটে ফেললেন। শোকার্ত হয়ে হনুমান রামকে এই কথা জানালেন। রাম ছিন্নমূল তরুর মতো ভূলুণ্ঠিত হলেন। লক্ষ্মণ বললেন, আর্য, ধর্ম নিরর্থক মনে হচ্ছে। ধর্ম আমাদের মঙ্গল রক্ষায় অসমর্থ। এখন দেখছি যে যার অর্থ আছে, সেই বিক্রমশালী মহাবল ও গুণিশ্রেষ্ঠ।

যস্যার্থাঃ স চ বিক্রান্তো যস্যার্থাঃ স চ বুদ্ধিমান্।
যস্যার্থাঃ স মহাবাহুর্যস্যার্থাঃ স গুণাধিকঃ ॥

আপনি উঠুন, আমিও অধর্ম দ্বারা ইন্দ্রজিৎকে বধ করব।

এই সময়ে বিভীষণ এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, রাবণ সীতাকে কিছুতেই হত্যা করতে পারবেন না। হনুমান যা দেখেছে তা মায়া সীতা। কাল নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ সমাপ্ত করবার আগেই ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে হবে।

বিভীষণের পরামর্শ মতো লক্ষ্মণ বানর ও ভল্লুক সৈন্য নিয়ে নিকুম্ভিলায় ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করে ভীষণ যুদ্ধে তাঁকে বধ করলেন। লক্ষ্মণকে বিভীষণ সাহায্য করছেন দেখে ইন্দ্রজিৎ তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিলেন, আর বিভীষণও তার উত্তর দিয়েছিলেন উপযুক্ত ভাষায়।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদে রাবণ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। তারপর সংজ্ঞা লাভ করে তিনি অনেক বিলাপ করলেন। ক্রমে সেই শোক ক্রোধে পরিণত হল। রামের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হবার পূর্বে তিনি সীতাকে বধ করতে উদ্যত হলেন। সুপার্শ্ব নামে এক অমাত্য তাঁকে এই স্ত্রী হত্যায় বাধা দিয়ে বলল, কাল অমাবস্যায় রামকে বধ করুন, তারপর সীতা তো আপনারই হবে।

রাম-রাবণের ঘোর যুদ্ধ হল পর দিন অমাবস্যায়। রাবণের সঙ্গে লঙ্কার সমস্ত বীর এল যুদ্ধ করতে—বিরূপাক্ষ মহোদর মহাপার্শ্ব।

গুরুজী বললেন : রাবণের জনপ্রিয়তার এও এক অদ্ভুত প্রমাণ। প্রতি দিন যুদ্ধে অসংখ্য রাক্ষস মরছে, শ্মশানে পরিণত হচ্ছে লঙ্কাপুরী। তবুও বিভীষণ ছাড়া আর একজনও রাবণের পক্ষ ত্যাগ করেন নি। সীতাকে ফিরিয়ে দেবার

মন্ত্রণাও যারা দিয়েছিল, তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে নি কোন রাক্ষস। ভয়ে হোক শাসনে হোক রাজভক্তিতে হোক—তাতে রাবণের মাহাত্ম্যই প্রকাশ পেয়েছে। স্বামীপুত্রহীনা রাক্ষসীরাও রাবণকে অভিসম্পাত দেয় নি, তারা এই বিপর্যয়ের জন্য শূর্পণখাকে দায়ী করেছে। বলেছে, কী দরকার ছিল সেই লম্বোদরী বৃদ্ধা শূর্পণখার রামের নিকট প্রেম নিবেদনের? সেই শুক্লকেশী লোলাঙ্গী বৃদ্ধা অমন হাস্যকর কুকার্য না করলে কি আজকের এই দশা হত! তার জন্যই তো রাবণ সীতা হরণ করলেন!

রাক্ষসীদের এই বিলাপে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাবণের সীতা হরণ কোন সুন্দরী নারীর রূপের আকর্ষণে নয়, লাঞ্ছিতা ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধের জন্য। সীতা হরণের পর তাঁকে বশে আনবার চেষ্টার জন্য রাবণের চরিত্রে আমরা কলঙ্ক আরোপ করতে পারি না, তিনি যুগোপযোগী পৌরুষের কাজই যে করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এ কোন লজ্জাকর হীন কাজ হলে তিনি রাজ সভায় বসে তাঁর বাসনার কথা ব্যক্ত করতে পারতেন না।

রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা গুরুজী বড় সংক্ষেপে বললেন। বিরূপাক্ষ মহোদর মহাপার্শ্ব রাবণের সঙ্গে এসেছিল। তারা নিহত হল। রাবণ লক্ষ্মণকে এড়িয়ে রামকেই আক্রমণ করলেন। বিভীষণ রামকে সাহায্য করছিলেন। বিরক্ত হয়ে রাবণ তাঁকে যখন আক্রমণ করলেন তখন লক্ষ্মণ এসে বিভীষণকে রক্ষা করলেন। রাবণ এইবারে শক্তিশেল নিক্ষেপ করে লক্ষ্মণকেই ভূপাতিত করলেন।

শোকের এ সময় নয় বলে রাম বিপুল বিক্রমে রাবণকে আক্রমণ করলেন। রথহীন রাবণ নিপীড়িত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। এইবারে রাম ভাইয়ের কাছে গিয়ে বললেন, আর আমি কী জন্য যুদ্ধ করব, জীবনেই বা আমার কোন্ প্রয়োজন! লক্ষ্মণ আমার বনবাসের সঙ্গী হয়েছিল, আমি তার যমালয়ের সঙ্গী হব। দেশে দেশে পত্নী ও বন্ধু মেলে, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা মেলে না কোনও দেশে।

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

কিন্তু বেশিক্ষণ রামকে বিলাপ করতে হল না। সুষেণের আজ্ঞায় হনুমান ওষধি এনে লক্ষ্মণকে পুনর্জীবিত করলেন। রাবণও নূতন রথ নিয়ে রণ স্থলে ফিরে এলেন।

ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় লক্ষ্মণ হনুমানের পিঠে উঠেছিলেন। এবারে রামের জন্য ইন্দ্র রথ ও অস্ত্র পাঠালেন। তাঁর সারথি মাতলি রথ নিয়ে এল।

দুজনে তুমুল যুদ্ধ হল, সমানে সমানে যুদ্ধ। অসুররা বলল, রাবণের জয় হবে, আর দেবতারা বললেন, রামের জয় সুনিশ্চিত। এক সময় রাবণকে অস্ত্র চালনায় অক্ষম ও মোহগ্রস্ত দেখে তাঁর সারথি তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

এই সময় অগস্ত্য এসে রামকে শত্রু বিনাশের স্তব শিখিয়ে দিলেন। তারপর রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলে আবার প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হল। রাম বার বার রাবণের শিরশ্ছেদ করলেন, বার বারই তাঁর দেহে নূতন মস্তক উদ্‌গত হল। রাম তখন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে রাবণকে বধ করলেন।

আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, কিন্তু বিভীষণ বিলাপ করে উঠলেন। বললেন, আমি যে আশঙ্কা করেছিলাম, তাই সত্য হল। নীতিজ্ঞ খ্যাতনামা মহাবীর, তোমার মৃত্যুতে রাক্ষসকুল বীরশূন্য হল। রাম বললেন, মহাবীর রাবণ ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন, আর তিনি আমাদের শত্রু নন, এখন আপনি তাঁর সংকারের আয়োজন করুন।

রাবণের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর অন্তঃপুরের রাণীরা সব ছুটে এলেন। ছিন্ন বনলতার মতো তাঁরা রাবণের দেহের উপরে পতিত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। মন্দোদরী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মহারাজ, সীতার প্রতি লোভের জন্যই তোমার এই দশা হল। কিন্তু তোমার বিরহে আমার হৃদয় কেন বিদীর্ণ হচ্ছে না!

রামের আদেশে বিভীষণ শকট যাজক চন্দনকাষ্ঠ অগুরু ও মণিমুক্তা শ্মশানে পাঠালেন। তারপর রাবণকে ক্ষৌমবাস পরিয়ে সোনার শিবিকায় সেখানে নিয়ে গেলেন। বিভীষণের সঙ্গে অধ্বর্যুরা আগে ও বেদনারতা রাণীরা গেলেন পিছনে। মাতামহ মাল্যবানের সামনে বিভীষণ পিতৃমেধ যজ্ঞের পরে রাবণের অগ্নি সংকার করে তর্পণ করলেন।

গুরুজী বললেন : রাক্ষস ও মানুষের সমাজ নিয়মে কোন প্রভেদ দেখি না। ব্রাহ্মণের পুত্র রাবণ রাক্ষস বলে পরিচিত। শৈশবে ব্রহ্মচর্য পালন করে বেদাধ্যয়ন করেছেন, কঠোর তপস্যা করেছেন শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। তাঁর রাজ্যে যাগ যজ্ঞ বেদ পাঠ হয়েছে, মৃত্যুর পরেও তাঁর অন্ত্যেষ্টি হল ব্রাহ্মণ প্রথায়।

তারপরে গুরুজী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : রাত এখন অনেক হয়েছে। আজ এই পর্যন্তই থাক।

সময়ের কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম।

রাবণের চরিত্র সম্বন্ধে পাধ্যে আমাকে দুটি অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণে নেই, কিন্তু অনেক রামায়ণে নাকি সে গল্প আছে। লঙ্কা আক্রমণ করবার

পূর্বে রাম সমুদ্র তীরে দুর্গা পুজা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাবণ বধের সংকল্প করে পূজা করতে পারেন এমন সাহসী কোন ব্রাহ্মণ পাচ্ছিলেন না। এ কথা জানতে পেরে রাবণ নাকি নিজে এসেছিলেন রামের কাছে, বলেছিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, আমি তোমার পূজা করব।

অন্য গল্পটিও এই রকমের। আহত রাবণ মৃত্যুশয্যায় রামকে শিখিয়েছিলেন রাজনীতি। এ গল্পও বাল্মীকি রামায়ণে নেই।



রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘামে বালিশ ভিজে গিয়েছিল, অথচ শীতার্ত রাতে লেপ কম্বল মুড়ি দিয়ে সবাই নিদ্রামগ্ন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার আছে ঘন হয়ে, রাত্রি প্রভাত হতে আর কত দেরি তা বোঝা গেল না।

ঘুম আর আসছিল না। আমি সেই স্বপ্নের কথাই ভাবছিলাম। শূর্পণখার মতো এক বিরূপা নারী যেন পায়ে পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। ভয়ে আমি পিছিয়ে আসতে চাইছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না। ক্রমে ক্রমে সেই নারীর সঙ্গে আমার দূরত্ব কমে আসছিল। আমি দেখছিলাম যে এবারে সে আমার দিকে হাত বাড়াচ্ছে, অস্বাভাবিক লম্বা হাত তার। দূর থেকেই আমাকে সে ধরে ফেলবে। আমি চিৎকার করে উঠতে চাইলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠ দিয়ে কোনও শব্দ বার হল না। ঠিক এই সময়ে একটা অভাবিত ঘটনা ঘটল। আমাকে রক্ষা করবার জন্যে কে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমি তা দেখতে পাই নি। তাঁকে দেখতে পেয়ে সেই নারী ভয়ে কাঁপতে লাগল। তারপরে সহসা পিছন ফিরে পালিয়ে গেল। আমিও পিছন ফিরে আমার রক্ষাকর্তাকে দেখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। বড় ক্লান্ত অবসন্ন মনে হল। তারপরেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

অনেকক্ষণ আমি এ পাশ ও পাশ করে কাটালাম। আমার পাশের খাটে চেমুলু গভীর ঘুমে অচেতন। সবাই এখন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু আমার চোখে আর ঘুম এল না।

অসুরদের কথা আমার মনে পড়ল। সত্য যুগের অসুরদের কথা আমরা শেষ করেছি, শেষ করেছি ত্রেতা যুগের রাক্ষসদের কথাও। গুরুজী আজ সন্ধ্যাবেলায়

দ্বাপরের রাক্ষসদের কথা বলবেন। কলি যুগে কি রাক্ষস নেই? না, তারা মানুষের রূপে মানুষদের মধ্যেই বিচরণ করছে! যে যুগে দেবতায় ও অসুরে কোন প্রভেদ ছিল না, সে যুগ গত হয়ে গেছে। সত্য যুগের অসুরদেরও আমরা নিন্দা করতে পারি না। তাদের ধর্ম ছিল, ধর্ম জ্ঞান ছিল গভীর। শিবের তপস্যার কথা জানি, ব্রহ্মাও তপস্যা করতেন। কিন্তু সাধারণ দেবতাকে তপস্যা করতে দেখি নি, তাঁরা মানুষের যজ্ঞে হবির ভাগ নিতে আসতেন। কিন্তু তপস্যা করেছে অসুরেরা, দৈত্য দানব রাক্ষসেরাও তপস্যায় বল সঞ্চয় করেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কৃপা লাভের যোগ্যতা লাভ করেছে কঠোর তপস্যায়। এঁদের আমরা নিন্দা করতে পারি না। এঁরা শক্তিতে স্মরণীয়, ভক্তিতে বরণীয়, নমস্য এঁরা।

তারপর এক দিন রাক্ষস নামের সঙ্গে নিন্দা জড়িয়ে গেল। কোন গুরুতর কারণের জন্য যে নয় তাতে সন্দেহ নেই। পুরাণকারদের সক্রিয় চেষ্টাতেও যাঁরা নিন্দার পাত্র হন নি, তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে ধীরে ধীরে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে গেলেন। কী করেছিলেন রাক্ষসেরা! ব্রাহ্মণের যজ্ঞ নষ্ট! দেবতারা করেন নি! দেবরাজ ইন্দ্রের অত্যাচারে কি ঋষিরা কখনও নির্বিঘ্নে তপস্যা করতে পেরেছেন! রাক্ষসেরা রক্ত মাংস ছিটিয়েছেন যজ্ঞ স্থলে, আর দেবরাজ অপ্সরা পাঠিয়েছেন ঋষির তপোভঙ্গের জন্য। ছলনা বঞ্চনা চরিত্রহীনতায় অসুরেরা দেবতাদের মতো পারদর্শী ছিলেন না। তবু আজ দেবতারা আমাদের পূজ্য, আর অসুররা হয়েছেন নিন্দার পাত্র। কী করে এমন হল, সেই কথাই আমি ভাবতে লাগলাম।

তারপর প্রভাত হল। একে একে সবাই উঠলেন জেগে। আমিও উঠলাম। মুখ হাত ধুয়ে যথারীতি বাগানের কাজে লেগে গেলাম।

এক সময় পাধ্যে আমাকে প্রশ্ন করলেন: তোমাকে কিছু কাবু দেখাচ্ছে আজ। রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো!

এ কথার উত্তর আমি দিলাম না।

পাধ্যে বললেন: তোমার চোখের দিকে তাকিয়েই আমার সন্দেহ হয়েছে যে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে রাতে। কিন্তু কেন?

আমি এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম। তারপর অকপটে বললাম আমার স্বপ্নের কথা। পাধ্যে মনোযোগ দিয়ে সব শুনে বললেন: ভয় নেই।

আমি বললাম: ভয় আবার কিসের!

পাধ্যে সহাস্যে বললেন: রাক্ষসীকে তোমার ভয় করে না! বেশী সাহস দেখাতে গেলে ঘাড় মটকে দেবে যে!

আমি বললাম : স্বপ্নের রাক্ষসী ঘাড় মটকায় না।

পাধ্যে বললেন : রাক্ষসী আজকাল পথে ঘাটে ছড়িয়ে আছে। সুযোগ পেলেই ঘাড় মটকে দেবে।

আমার ঠাকুমা আমাকে এমনি করে ভয় দেখাতেন।

তিনি সব জানতেন বলেই তোমাকে সাবধান করতেন। আর তুমি কিছু জান না বলেই ভয় পাও না। এ যুগের রাক্ষসীরা তো দেখতে শূর্পণখার মতো নাক কাটা নয়—

বলেই পাধ্যে থেমে গেলেন।

আমি এর কারণ বুঝতে না পেরে হাতের কাজ ফেলে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু পাধ্যে তখন যেন অন্য জগতের মানুষ। মুখে সেই হাসি নেই, গভীর অভিনিবেশে তাঁর কাজে ব্যস্ত। আমি এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হলাম। তারপরেই এর কারণ বুঝতে পারলাম। পিছন থেকে মিসেস খুরানা আমাকে ধমক দিলেন : এ কি, এখনও আপনি তৈরি হন নি?

আমি চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকালাম।

মিসেস খুরানাকে আজ অপরূপ দেখাচ্ছে। মুখে রঙ মেখেছেন কম। আর সুন্দর একখানা শাড়ি পরেছেন জামার রঙের সঙ্গে মানিয়ে। আমি তাঁকে কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না।

মিসেস খুরানা বললেন : নিন নিন, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। রোধ প্রখর হবার আগেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

আমি পাধ্যের দিকে তাকালাম। তিনি কটমট করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

মিসেস খুরানা বললেন : নিন, উঠুন।

সহসা আমাদের নিকটে যেন বজ্রপাত হল। যেন তড়িতাহত হয়েছি এমনি তৎপরতায় আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম।

না, বজ্রপাত নয়। গুরুজীর কণ্ঠস্বর আমরা শুনেছি। তিনিই আমার নাম ধরে আমাকে ডেকেছিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন : এস।

আমি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করি নি। হাতের খুরপি সেখানে ফেলে রেখেই তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। মিসেস খুরানা কী করলেন, তা আর দেখতে পেলাম না।

·

গুরুজী আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন : বসো।

বসবার আগে আমি নিজের হাত পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, ধুলোকাদায় নোংরা পায়ে তাঁর ঘরে ঢুকতে আমার দ্বিধা হয়েছিল। হঠাৎ আমি তাউজীকে সামনে দেখতে পেলাম, তাঁর হাতে এক ঘটি জল। তিনি সেই জল আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি হাত পা ধুয়ে গুরুজীর ঘরে এসে বসলাম। কিন্তু তাউজী এলেন না। তিনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

আমার মনে হল যে এঁরা দুজনেই আমার দিকে নজর রেখেছিলেন। কিন্তু কেন নজর রেখেছিলেন তার কারণ আমি জানলাম না।

গুরুজী নিজের আসনে বসে আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। লেখা কত দূর হয়েছে, কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, এই সব। অসুবিধার কথায় আমি বললাম : অসুরদের আমি ঠিক অসুরের মতো করে আঁকতে পারছি না, তাঁদের সঙ্গে দেবতাদের কোন তফাৎ হচ্ছে না।

গুরুজী গম্ভীর ভাবে বললেন : তাহলে তো ঠিক হচ্ছে না।

আমি বললাম : এই কারণে আমার আর লিখতে ইচ্ছা করছে না। অসুরদের কিছুতেই আমি খারাপ বলতে পারছি না।

দেবতাদের চেয়ে কি তাদের ভাল বলছ ?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম : অনেক সময় বোধহয় তাও হয়ে যাচ্ছে।

সহাস্যে গুরুজী বললেন : তবে ঠিকই হচ্ছে। দেবতারা জন্মেছেন দেবতা হয়ে, কিন্তু অসুরেরা দেবত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের কর্ম দিয়ে। কাজেই কোন কোন অসুরকে দেবতার চেয়েও মহান্ মনে হবে।

গুরুজীর এই কথা শুনে আমার রোমাঞ্চ হল। আমার তাহলে ভুল হয় নি।

গুরুজী বললেন : মানুষের কথাও এই রকম। এক একজন মানুষ আপন কর্মে দেবতার মতো ভাস্বর হয়েছেন। তাঁদের মহত্বও হৃদয়গ্রাহী।

একটু থেমে বললেন : আবার বিপরীত ধর্মের মানুষও আছেন। ধর্ম যাদের জীবন পরিচালিত করে না, অসত্যের মোহে যাদের হৃদয় অভিভূত, ভোগবিলাসী সেই মানুষদের আমরা কোন্ নামে ডাকতে পারি ! পুরাকালে তমোগুণাশ্রয়ী এই মানুষদেরই আমরা রাক্ষস বলেছি। মানুষের বর্বরোচিত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে ঋষিরা শাপ দিয়েছেন, রাক্ষস হও। মানুষের সমাজে এই রাক্ষস আজও আছে। আজও তারা সরল মানুষকে সত্যভ্রষ্ট ধর্মচ্যুত করবার জন্যে মোহের ফাঁদ পেতে রেখেছে। রাক্ষসকে এ যুগে তার আকৃতি দিয়ে চেনা যায় না। বাহিরের আচার আচরণে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নেই। জীবনের পথ তাই আজ আরও দুর্গম হয়েছে, প্রতি পদক্ষেপে আমাদের সতর্ক থাকবার প্রয়োজন

দিয়েছে দেখা।

নিঃশব্দে আমি গুরুজীর কথা শুনছিলাম।

গুরুজী বললেন: আজ রাতে আমি তোমাদের দ্বাপরের অসুরদের কথা বলব। অসুর বললে ভুল হবে, তাঁরা সাধারণ মানুষ। চেদিরাজ শিশুপালের নাম তোমরা মহাভারতে পড়েছ। তাঁর জন্ম হয়েছিল চার হাত ও তিন চোখ নিয়ে। তারপর দুটো হাত খসে পড়েছিল, আর তৃতীয় চোখটিও গিয়েছিল মিলিয়ে। তারপরে তাঁকে আর অসুর বা রাক্ষস বলা চলে না। সাধারণ মানুষ বলেই তিনি সমাজে পরিচিত ছিলেন। তবু আমি অসুরের কথায় তাঁর আলোচনা করব। বিষ্ণুর দ্বাররক্ষী জয় বিজয়ের দুটো জন্মের কথা বলেছি। তাঁরা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু রূপে জন্মেছিলেন সত্য যুগে, ত্রেতায় তাঁরা হয়েছিলেন রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, আর দ্বাপরে তাঁরা জন্মেছিলেন শিশুপাল ও তাঁর ভাই দন্তবক্র নামে। ছোটখাট রাক্ষস আরও অনেক আছে। কয়েকজনকে কৃষ্ণ বধ করেছিলেন বাল্য কালে, ভীমের হাতে নিহত হয়েছে কয়েকজন, কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন বধ করেছিলেন শম্বরাসুরকে। আমাদের অসুরের কথা আজ রাতে শেষ হবে।

এই সময়ে তাউজী ঘরে এলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে গুরুজী বললেন: বিনায়ক অসুরের কথা খুব যত্ন করে লিখছে। আজ ও তোমার ঘরে বসে লিখুক, ওকে যেন কেউ আজ বিরক্ত না করে।

তাউজী আমাকে বললেন: চল।

আমি তাঁর সঙ্গে গুরুজীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

তাউজী আমাকে একা ছেড়ে দিলেন না। আমাদের ঘর পর্যন্ত সঙ্গে এলেন। আমি আমার খাতাপত্র সংগ্রহ করে তাঁর সঙ্গেই ফিরে এলাম। মিসেস খুরানাকে আমি দেখতে পেলাম না, দেখলাম স্বপ্নিকে। ওধারে শকুন্তলাদি ঘরের বারান্দা থেকে আমাকে দেখছিলেন। আমাকে তাকাতে দেখে পরম কৌতুকে হাসলেন নিঃশব্দে। তারপরেই গম্ভীর হয়ে অন্য দিকে তাকালেন। আমি দেখলাম যে তাউজী তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছেন।

তাউজীর ঘরে এসে আমি যখন লিখতে বসলাম, তখন আমার প্রথমেই মনে পড়ল মিসেস খুরানার কথা। কাল অপরাহ্ণে তিনি আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। আশ্রম থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে আমরা বসেছিলাম, সেখানে আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন শুধু পাধ্যে। তিনিও বেড়াতে বেরিয়েছিলেন কিন্তু আজ সকালে যে মিসেস খুরানা আমাকে আবার টেনে নিয়ে যেতে চেয়ে-

ছিলেন, সে কথা কেউই জানতেন না। পাধ্যেকে আমি স্বপ্নের কথা বলেছি, কিন্তু সত্য কথা বলি নি। পাধ্যে এই স্বপ্নের কথাও কাউকে বলবার অবকাশ পান নি। তার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। মিসেস খুরানা আমাকে টেনে নিয়ে যাবার সুযোগ পেলেন না, তার আগেই গুরুজী আমাকে রক্ষা করলেন। আমার মনে হল যে গুরুজী সবই জানতেন, বা বুঝেছিলেন সবই। তাই সময় মতোই আমাকে সরিয়ে আনলেন, আর তাউজীর কাছেও আমাকে সমর্পণ করলেন একই উদ্দেশ্যে। তাঁর চোখের সামনে থাকলে মিসেস্ খুরানা আমাকে অধিকার করতে পারবেন না। কিন্তু গুরুজী তাঁকে সন্দেহ করলেন কেন !

তাউজী যে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন, আমি তা টের পাই নি। বললেন : সৎ কাজে বিপত্তি কখনও বড হয়ে উঠতে পারে না। তুমি লিখতে আরম্ভ করলেই দুর্ভাবনা দূর হয়ে যাবে।

তাউজীর এই কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। ইনিও কি আমার মনের কথা বুঝতে পারছেন ! আমি বোধহয় চমকে উঠেছিলাম।

তাউজী হেসে বললেন : আর কোনও ভাবনা নয়। রাবণের চরিত্র আমরা কাল শুনেছি। তাড়াতাড়ি লিখে ফেল সেটা। তারপর যাদের কথা লিখবে, তাদের রাক্ষস বলে চেনা কঠিন হবে। তোমার আমার মতোই সাধারণ মানুষ তারা। তবু আমাদের চিনে রাখতে হবে। সময় মতো চিনতে না পারলেই বিপদ।

তাউজীর কথার কোন উত্তর আমি দিলাম না। রাবণের চরিত্র আমাকে লিখে রাখতে হবে। কুম্ভকর্ণের চরিত্রও।

তারপরে শিশুপাল ও দন্তবক্র।



ধূপ ও ধুনার গন্ধে উপাসনার মন্দির আজ আকুল হয়ে উঠেছিল। আরও স্নিগ্ধ শীতল মনে হচ্ছিল প্রদীপের আলো। কারও মুখে আজ কোন কথা নেই। সুপ্তিকেও বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে। মিসেস খুরানার পাশে বসেছেন দণ্ডপাণি। আমি আজ সারা দিন তাউজীর সঙ্গে আছি। তাঁরই সঙ্গে আজ গীতা ভবনে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

গুরুজীকে আসতে দেখে অভ্যাস মতো আমরা উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বসবার পরে বসলাম সবাই। গুরুজী প্রসন্ন মুখে বললেন: আজ আমরা অসুরের কথা শেষ করব। কাল থেকে নতুন কোন কথা।

অসুরের কথার পরে কোন্ কথা, কেউ তা জিজ্ঞাসা করলেন না।

গুরুজী বললেন: রামায়ণেই আমরা রাক্ষসকুলের ধ্বংস দেখতে পাই। সত্য ও ত্রেতা যুগের অসুর দৈত্য দানব ও রাক্ষসেরা বলবীর্যে বিখ্যাত ছিল। দ্বাপরে আমরা সে রকমের ব্যক্তিত্ব দেখতে পাই নে। দু জন রাজাকে দেখি ভারতের পূর্ব প্রান্তে, প্রাগজ্যোতিষপুরে নরক ও শোনিতপুরে বাণ। আর যাদের দেখি, তাদের প্রতি আমাদের কোন শ্রদ্ধা জাগে না।

শিশু কৃষ্ণকে হত্যা করবার চেষ্টা যারা করেছিল তাদের নাম আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতে পেয়েছি। তাদের মধ্যে প্রথম হল পুতনা রাক্ষসী। রাজা কংস নন্দব্রজে পুতনাকে পাঠিয়েছিলেন শিশু বধের জন্য। সুবেশা নারীর রূপে পুতনা কৃষ্ণকে দেখবার ছলে নন্দের গৃহে এল। রোহিণী ও যশোদা তার রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন। পুতনা আদর করে কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে নিজের বিষলিপ্ত স্তন্য দান করল। কৃষ্ণ সরোষে তার প্রাণের সহিত তা পান করতে লাগলেন। রাক্ষসী ছাড ছাড রবে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। তারপর তার মৃত্যু হল। রাক্ষসীকে তখন সবাই চিনতে পারলেন।

এ ঘটনার পর কংস তৃণাবর্ত নামে এক দৈত্যকে পাঠালেন কৃষ্ণকে বধ করবার জন্য। ধূলায় আকাশ আচ্ছন্ন করে ভীষণ শব্দ করে এল দৈত্য। সকলের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হল। এই সুযোগে তৃণাবর্ত কৃষ্ণকে নিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না, শিশু তার কাছে বিপুল ভার বোধ হল। কৃষ্ণ তার গলা ধরেছিলেন, তাতেই তার মৃত্যু হল।

বাল্য কালে কৃষ্ণ এই রকম করে বৎসাসুর বকাসুর ও অঘাসুর বধ করেছিলেন। কৃষ্ণরা যখন গরু চরাতেন, তখন বৎসের রূপ ধারণ করে এক দৈত্য এসে জুটেছিল। কৃষ্ণ তাকে চিনতে পেরে তার লেজ ধরে তাকে একটা গাছের উপরে নিক্ষেপ করেছিলেন, তাতেই বৎসাসুরের মৃত্যু হয়। বকাসুর এসেছিল বক পাখির রূপ ধরে। তার ভীষণ চঞ্চু বিস্তার করে কৃষ্ণকে যখন গ্রাস করতে আসে, তখন কৃষ্ণ তার দুই চঞ্চু ধরে তাকে বিদীর্ণ করে দেন। অঘাসুর পুতনার ছোট ভাই। অজগরের মূর্তি ধরে সে এসেছিল কৃষ্ণকে গিলতে। গোপ বালকদের সে গিলে ফেলেছিল, তাদের রক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণও তার মুখের ভিতর ঢুকে পড়লেন। তারপর নিজের শরীর এমন বৃদ্ধি করলেন যে তাতেই অঘাসুরের মৃত্যু হল।

ধেনুকাসুর ও প্রলম্বাসুর বধ করেছিলেন বলরাম। ধেনুকাসুরের ভয়ে কেউ তাল ফল খেতে পেত না। বলরাম সেই গর্দভরূপী ধেনুকাসুরের পা ধরে তাকে তালগাছের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন। তার বন্ধুরা তাঁকে আক্রমণ করলে বলরাম তাদেরও ধ্বংস করেন। প্রলম্বাসুর গোপের রূপে তাঁদের সঙ্গে মিশেছিল, বলরাম তার কাঁধে চড়ে মাথায় ঘুষি মেরে তাকে বধ করেছিলেন।

আরও দু জন অসুর এই সময়েই কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়। তাদের নাম অরিষ্ট ও কেশী। অরিষ্ট বৃষভাকৃতি নিয়ে ব্রজভূমি কাঁপিয়ে গোষ্ঠে এসেছিল। শৃঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণকে যখন আক্রমণ করতে এল, তখন কৃষ্ণ তার দুই শৃঙ্গ ধরে দূরে নিক্ষেপ করলেন। সে আবার যখন ফিরে এল তখন তার শৃঙ্গ উৎপাটন করে তাকে বধ করলেন! এর পরে কংস কেশী দানবকে পাঠালেন। কেশী অশ্বের মূর্তি ধরে প্রবল শব্দ করে কৃষ্ণের নিকটে এল এবং পিছনের পা দিয়ে তাঁকে প্রহার করল। কৃষ্ণ তার সেই পা ধরে তাকে দূরে নিক্ষেপ করলেন। কেশী আবার যখন তেড়ে এল, তখন কৃষ্ণ তার মুখে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেই হাত এমন স্ফীত করলেন যে তাতেই কেশীর দাঁত খসে চোখ ঠিকরে প্রাণ বেরিয়ে গেল।

এক সঙ্গে এতগুলি অসুরের কথা বলে গুরুজী একটু থামলেন। তাঁকে থামতে দেখে তাউজী বললেন : এ সমস্ত ঘটনা অলৌকিক বলে বোধ হচ্ছে।

গুরুজী বললেন : তা হবেই। তার কারণ শ্রীমদ্‌ভাগবতে কৃষ্ণকে ভগবান বিষ্ণুর অংশ বলে প্রচার করা হয়েছে। মহাভারতের কৃষ্ণ ঠিক এ রকম নন।

তাউজী বললেন : যে অসুরদের কথা বললেন, তাদের কোন পরাক্রম দেখি না। দ্বাপরে কি কোন পরাক্রমশালী অসুর ছিল না ?

গুরুজী একটু ভাবলেন, তারপর বললেন : শোনিতপুরের বলিপুত্র বাণের কথা আগেই বলেছি। ঊষাহরণের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে যাদবদের প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নরকাসুরও প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁর অন্তঃপুরে দেবাসুর সিদ্ধ ও রাজাদের শতাধিক ষোল হাজার কন্যা ছিল। নরকাসুর ইন্দ্রের মাতা অদিতির কুণ্ডলাদি হরণ করেন। ইন্দ্র কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। কৃষ্ণ এসে দেখলেন যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নগর দুর্ভেদ্য দুর্গ ও পর্বতে খুবই সুরক্ষিত। মুর নামে এক দৈত্য নগর রক্ষায় নিযুক্ত। কৃষ্ণ এসে শঙ্খনাদ করলেন, মুর জল থেকে উঠে সসৈন্যে কৃষ্ণকে আক্রমণ করল। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর চক্র দিয়ে মুরের মস্তক ছেদন করলেন। একে একে নরকাসুরের সেনাপতি ও পুত্ররাও নিহত হল। তখন নরকাসুর নিজে এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। শ্রীকৃষ্ণ চক্র দিয়ে তাঁরও মাথা কেটে ফেললেন। নরকাসুরের মা কৃষ্ণের স্তব করে তাঁকে তুষ্ট করলেন, ফিরিয়ে দিলেন অদিতির কুণ্ডল

অপহৃত অন্যান্য দ্রব্য। নরকাসুরের অন্তঃপুরের সমস্ত কন্যাকেও কৃষ্ণ দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে বিবাহ করলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা হলেন নরকের পুত্র ভগদত্ত। ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। দ্রোণ পর্বের সে গল্প নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে।

কেউ মনে আছে বললেন না। বরং তাউজী বললেন : আপনি বলুন।

গুরুজী বললেন : ভগদত্ত এক সুসজ্জিত হাতীর পিঠে চড়ে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁর গলায় মালা ও মাথায় শ্বেত ছত্র। যে হাতীতে চড়ে ইন্দ্র দৈত্য দানব জয় করেছিলেন, সেই হাতীর বংশধর ছিল ভগদত্তের বাহন। ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে দশার্নরাজ নিহত হলেন ও পাঞ্চালসৈন্য ভয়ে পালাতে লাগল। ভগদত্ত ভীমের দিকে ধাবিত হলেন। হাতীর গর্জন শুনে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এ নিশ্চয়ই ভগদত্তের হাতী, এ তো অস্ত্রের আঘাত ও আগুনের স্পর্শ সইতে পারে, ভগদত্ত আজ সমস্ত পাণ্ডব সেনা ধ্বংস করবে। তারপর অর্জুন এসে ভগদত্তের সম্মুখীন হলেন। তুমুল যুদ্ধ হল। কৃষ্ণার্জুনকে বধ করবার জন্য ভগদত্ত হাতীকে চালনা করলেন। কৃষ্ণ রথ সরিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। অর্জুন শরাঘাতে হাতীর বর্ম ছিন্ন করলেন। তাই দেখে ভগদত্ত মন্ত্রপাঠ করে অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে পিছনে রেখে নিজের বুকে সেই অস্ত্র ধারণ করলেন। বৈজয়ন্তীর মালা হয়ে সেই বৈষ্ণবাস্ত্র কৃষ্ণের কণ্ঠলগ্ন হল!

অর্জুন খুবই দুঃখিত হলেন। বললেন, কৃষ্ণ, তুমি যুদ্ধ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, কিন্তু আমি সমর্থ ও সতর্ক থাকতেও তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে!

কৃষ্ণ বললেন, পৃথিবীর প্রার্থনায় তাঁর পুত্র নরকাসুরকে আমি বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়েছিলাম। পিতার কাছে ভগদত্ত এই অস্ত্র পেয়েছে। সমগ্র বিশ্বে এই অস্ত্রের অবধ্য কেউ নেই, তাই তোমাকে রক্ষার জন্যই আমাকে এই অস্ত্র ধারণ করতে হল। এখন এই মহাসুর ভগদত্তকে তুমি বধ কর।

নারাচ নিক্ষেপ করে অর্জুন ভগদত্তের বাহন হাতীটি বধ করলেন। তারপর অর্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুরের পুত্র ভগদত্তের মৃত্যু হল।

গুরুজী বললেন : এখানেও আমরা দেখতে পাই যে ভগদত্তকে বধ করবার জন্য দৈব শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল। কৃষ্ণ রক্ষা না করলে অর্জুন আত্মরক্ষায় সমর্থ হতেন না। অসুরেরা চিরকাল প্রতারিত হয়েছে।

তারপরে তাউজীর দিকে তাকিয়ে বললেন : এবারে কার কথা বলতে হবে?

তাউজী বললেন : আপনি যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পৌঁছে গেছেন, তখন ঘটোৎ-

কচের কথা বলুন।

গুরুজী বললেন : ঘটোৎকচের আগে হিড়িম্বার কাহিনী, কিন্তু তার আগে বক রাক্ষসের কথা বলি।

মহাভারতের আদি পর্বে জতুগৃহ দাহের পরের ঘটনা। পঞ্চপাণ্ডব এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিয়ে আছেন। এমন সময় এক দিন ব্রাহ্মণের পরিবারে ক্রন্দন শুনলেন। তার পর দিন পরিবারের একজনকে বকরাক্ষসের নিকট অন্ন নিয়ে যেতে হবে। রাক্ষস তাকে ভক্ষণ করবে। কুন্তীর আদেশে ভীম গেলেন। তারপর যুদ্ধ করে বক রাক্ষসকে বধ করলেন। এ ঘটনা আমরা শৈশবেই পড়েছি।

বক রাক্ষসের ভাই কির্মীরের কথাও পড়েছি শৈশবে। বনপর্বে পাণ্ডবরা যখন কাম্যক বনে প্রবেশ করলেন, তখন এই ভয়ানক কির্মীর পাণ্ডবদের আক্রমণ করে-ছিল। বলেছিল ভীম আমার ভাইকে বধ করেছে, আমার প্রিয় সখা হিড়িম্বকে বধ করে তার ভগিনীকে হরণ করেছে। এবারে আমি তাকে বধ করে ভক্ষণ করব। ভীম একটা গাছ উপড়ে নিয়ে কির্মীরকে আক্রমণ করলেন ও প্রবল যুদ্ধে তাকে বধ করলেন।

অবশ্য ভীম এই ঘটনার অনেক দিন আগেই হিড়িম্বাকে বিবাহ করেছিলেন। জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবরা চার ভাই ও মা কুন্তী সুখে নিদ্রামগ্ন ছিলেন এবং ভীম সবাইকে পাহারা দিচ্ছিলেন। হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস মানুষের গন্ধ পেয়ে ভারি খুশী, ভগিনী হিড়িম্বাকে আনন্দের সংবাদ দিয়ে বলল যে দুই ভাই-বোনে মানুষের রক্ত ও মাংস খাবে। হিড়িম্বা গেল মানুষের খোঁজে। তারপরে মহাবাহু সিংহ-স্কন্ধ উজ্জ্বলকান্তি ভীমকে দেখে মুগ্ধ হল। ভাবল যে এই পুরুষকে পতি রূপে পেলে তার জীবন ধন্য হবে। রাক্ষসীরা কামরূপিণী, মানে ইচ্ছা মতো রূপ ধারণ করতে পারে। হিড়িম্বাও সুন্দরী নারীর রূপে সুসজ্জিতা হয়ে ভীমের নিকটে এল। সলজ্জায় স্মিত হাস্যে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। তারপরে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে বলল যে তার ভাই হিড়িম্ব রাক্ষস তাদের ভক্ষণ করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু—

গুরুজী একটু থেমে বললেন : হিড়িম্বা স্বীকার করতে দ্বিধা করল না যে সে ভীমকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, প্রস্তাব করল বিবাহের। ভগিনীর বিলম্ব দেখে হিড়িম্ব এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখতে পেয়ে হিড়িম্বা বলল, আসুন আপনাদের সবাইকে আমি আকাশ পথে নিয়ে যাব। ভীম বললেন, তোমার ভয় নেই, মানুষ বলে আমাকে অবজ্ঞা কোরো না। নিজেদের আমরা রক্ষা করতে পারব।

হিড়িম্ব ভগিনীকে দেখে বিস্মিত হল। বসনে ভূষণে অলঙ্কারে ও ফুলের মালায়

হিড়িম্বাকে অপরূপ সুন্দরী দেখাচ্ছে। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে হিড়িম্ব বলল, তুমি অসতী, এদের সঙ্গে তোমাকেও আমি বধ করব।

এ কথার উত্তর দিলেন ভীম, বললেন, তোমার ভগিনীর কোন দোষ নেই। সকলের বুকে আছেন যে অনঙ্গদেব তাঁরই প্রেরণায় ইনি আমাতে অনুরাগী হয়েছেন। তুমি যদি যুদ্ধ চাও তো একটু তফাতে এসে যুদ্ধ কর, অকারণে আমার ভাইদের তুমি জাগিয়ো না।

তারপরে ঘোর বাহু যুদ্ধ হল ভীমের সঙ্গে হিড়িম্ব রাক্ষসের। সেই যুদ্ধে ভীমের হাতেই হিড়িম্ব প্রাণ হারাল। যুদ্ধের শব্দে সবাই জেগে উঠেছিলেন। হিড়িম্বার সঙ্গে সবার পরিচয় হল। কুন্তীকে প্রণাম করে হিড়িম্বা তার প্রার্থনা জানাল। স্থির হল যে ভীম এখন হিড়িম্বাকে বিবাহ করে তার সঙ্গে থাকবেন এবং একটি পুত্রের জন্ম হলেই তাকে পরিত্যাগ করে ফিরে আসবেন।

এই পরিণয়ে ঘটোৎকচের জন্ম হল। ভীষণাকার বলবান পুত্র, তীক্ষ্ণ দন্ত তাম্রবর্ণ ওষ্ঠ ও ভয়ানক কণ্ঠস্বর। ঘটের মতো মাথা ও খাড়া চুল দেখে হিড়িম্বা তার নাম রাখল ঘটোৎকচ। রাক্ষসের নিয়মানুসারে জন্মেই সে যৌবন লাভ করল। কুন্তী ও পাণ্ডবদের প্রণাম করে বলল, আজ্ঞা করুন। কুন্তী বললেন, পাণ্ডবদের তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রয়োজন হলে তুমি আমাদের সাহায্য কোরো। ঘটোৎকচ স্বীকৃত হয়ে উত্তর দিকে চলে গেল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেও আমরা ঘটোৎকচকে দেখতে পাই। দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবরা কৈলাস যাত্রা করেছেন। গন্ধমাদন পর্বতে ঝড় বৃষ্টির পরে দ্রৌপদী আর চলতে পারলেন না, শ্রান্ত ও অবশ হয়ে পড়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির বিলাপ করতে লাগলেন। দুর্গম তুষারাবৃত পথ দ্রৌপদী কেমন করে অতিক্রম করবেন! তখন ভীম ঘটোৎকচকে স্মরণ করলেন। ঘটোৎকচ তখনই এসে উপস্থিত হল এবং ভীমের আদেশে দ্রৌপদীকে আকাশ মার্গে বহন করে নিয়ে চলল।

গুরুজী বললেন : এই ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল। ভীষ্ম পর্বে ভগদত্তের শরাঘাতে ভীম যখন মূর্ছিত হয়েছিলেন, তখন ঘটোৎকচ ভগদত্তকে আক্রমণ করে ও ভগদত্ত পালাতে বাধ্য হন। কৃষ্ণই ঘটোৎকচের মৃত্যুর কারণ। তিনি এ কথা স্বীকার করতে একটুও দ্বিধা করেন নি।

গুরুজীর এই কথা শুনে আমরা যারপরনাই আশ্চর্য হলাম। ভীমের পুত্র ঘটোৎকচকে কৃষ্ণ বধ করবেন, এ আমাদের স্বপ্নেরও অতীত। গুরুজী বললেন : ঘটোৎকচ বধের কথা তোমাদের বোধহয় মনে নেই। দ্রোণ পর্বে রাত্রি-যুদ্ধ হচ্ছে। কৌরবদের প্রাথমিক পরাজয়ে দুর্যোধন বাক্যের কশাঘাতে দ্রোণ ও কর্ণকে

উত্তেজিত করলেন। কর্ণ অবিরাম শরবর্ষণে পাণ্ডব সেনা ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, কর্ণ বোধহয় আজ আমাদেরও সংহার করবে। তাকে বধের জন্য যা করা উচিত তাই কর।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, শীঘ্র আমাকে কর্ণের কাছে নিয়ে চল। হয় আমি মরব, নয় তাঁকে মারব।

কৃষ্ণ বললেন, আজ তুমি এবং রাক্ষস ঘটোৎকচ ছাড়া আর কেউ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না। কিন্তু এখন তার সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয়, এখন তার কাছে তোমাকে মারবার জন্য শক্তি অস্ত্র আছে। এখন ঘটোৎকচ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করুক। ঘটোৎকচের কাছেও দৈব রাক্ষস ও অসুর অস্ত্র আছে, কর্ণকে যে সে জয় করতে পারবে তাতে আমার সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণের আহ্বানে ঘটোৎকচ এসে তাঁকে অভিবাদন করল। সশস্ত্র মেঘবর্ণ বীর দীপ্ত কুণ্ডলধারী। কৃষ্ণ তাকে সহাস্যে বললেন, পুত্র ঘটোৎকচ, এখন তোমার বিক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত হয়েছে। রাক্ষসেরা তো রাত্রেই বেশি বলবান হয়, তুমি তোমার রাক্ষসী মায়ায় ও অস্ত্রে তোমার আত্মীয়দের রক্ষা কর।

কৃষ্ণার্জুনের আজ্ঞা পেয়ে ঘটোৎকচ কর্ণের দিকে ধাবিত হল। তার বিশাল নীলবর্ণ দেহে কাংসের বর্ম, বিকট কেশচূড়ার উপরে শুভ্র কিরীট, লাল চক্ষু, পিঙ্গল শ্মশ্রু, করাল দন্ত, কর্ণে তার অরুণবর্ণ কুণ্ডল। শত অশ্ববাহিত ভল্লুকচর্মাবৃত সুবৃহৎ রথে ঘটোৎকচ অগ্রসর হল। তারপর ঘোর যুদ্ধ হল কর্ণের সঙ্গে। কিছুক্ষণ সম্মুখ যুদ্ধে শরবর্ষণের পর ঘটোৎকচ যখন মায়া যুদ্ধ আরম্ভ করল, তখন কৌরব সেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে লাগল। কেবল কর্ণই স্থির হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

এই সময়ে অলায়ুধ নামে এক রাক্ষস কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করতে এল। কিন্তু ঘটোৎকচের হাতে তার মৃত্যু হল।

ঘটোৎকচ এক শতঘ্নী নিক্ষেপ করে কর্ণের চারটি অশ্ব বধ করল। কৌরবরা বলল, কর্ণ, তোমার শক্তি অস্ত্রে শীঘ্র এই রাক্ষসকে বধ কর, তা না হলে আমরা সসৈন্যে মারা পড়ব। ইন্দ্রাদি দেবতারা পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করছেন ভেবে চারি দিকে তখন পালাও পালাও রব উঠেছে।

কর্ণ দেখলেন যে আর উপায় নেই। ইন্দ্রদত্ত যে বৈজয়ন্তী শক্তি তিনি অর্জুনকে বধের জন্য বহু বৎসর সযত্নে রেখেছিলেন, সেই শক্তি তাঁকে ঘটোৎকচের দিকে নিক্ষেপ করতে হল। ঘটোৎকচ নিহত হল, কিন্তু মরণ কালে সে তার দেহ বিন্ধ্য পর্বতের মতো বিশাল করে আকাশ থেকে কৌরব সেনার উপরে পড়ল, সেই ভারে অসংখ্য সেনা মারা পড়ল।

গুরুজী বললেন : তারপরে আমরা কৃষ্ণের অন্য এক রূপ দেখতে পাই। সমস্ত পাণ্ডব যখন ঘটোৎকচের জন্য শোকে মুহ্যমান, তখন কৃষ্ণ রথের উপর নৃত্য করতে লাগলেন। অর্জুন এই আচরণে দুঃখ পেয়ে কৃষ্ণকে তাঁর হর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণ বললেন, ঘটোৎকচকে বধ করে কর্ণ নিজের মৃত্যুর পথই তৈরি করেছেন। তাঁর অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল গেছে, ইন্দ্রদত্ত শক্তিও গেল। তোমার মঙ্গলের জন্য আমি জরাসন্ধ শিশুপাল ও একলব্যকে বধ করিয়েছি। এঁরা বেঁচে থাকলে আজ তোমাদের বিপক্ষে যেতেন। জগতের হিতার্থে দেবদ্বেষীদের বিনাশের জন্য আমি হিড়িম্ব, বক, কির্মীর, অলায়ুধ এবং ঘটোৎকচকেও নিহত করিয়েছি। কর্ণ বধ না করলে আমিই ঘটোৎকচকে বধ করতাম। তোমাদের অপ্রীতির কাজ আমাকে করতে হল না।

তাউজী বলে উঠলেন : কিন্তু ঘটোৎকচ কী দোষ করেছিল ?

গুরুজী বললেন : কৃষ্ণ এই রাক্ষসকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ধর্মনাশক পাপাত্মা বলেছেন। তাই তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন—ইন্দ্রের অমোঘ শক্তি অস্ত্রের ব্যয়ে ঘটোৎকচ নিহত হল, আর রক্ষা পেলেন অর্জুন।

কৃষ্ণের এই আচরণ আমি সমর্থন করতে পারলাম না। যুদ্ধে পাঠাবার পূর্বে যাকে পুত্র ঘটোৎকচ বলে সম্বোধন করে প্রশংসা করলেন তার পরাক্রমের, তার মৃত্যুতে রথের উপরে নৃত্য এক মর্মান্তিক পরিহাস।

গুরুজী বললেন : যুধিষ্ঠির তাঁর চোখ মুছে বলেছিলেন, যে মানুষ উপকার মনে রাখে না তার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। ঘটোৎকচ তার শৈশব থেকেই আমাদের উপকার করেছে নানা ভাবে। আমাদের বনবাস কালে সে অনেক সাহায্য করেছে, যুদ্ধেও এ যাবৎ অসাধ্য সাধন করেছে। আমরা জীবিত থাকতে আমাদের সকলের চোখের সামনে সে কেন প্রাণ হারাল !

কৃষ্ণ এ কথার উত্তর দিতে পারেন নি, উত্তর দিয়েছিলেন ব্যাসদেব। তিনি এসে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, অর্জুন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ না করে আজ রক্ষা পেয়েছেন। ঘটোৎকচ নিজে মরে অর্জুনকে বাঁচিয়ে গেলেন। তার জন্য শোক কোরো না।



শিশুপাল ও দন্তবক্রের কথা গুরুজী খুব সংক্ষেপে বললেন। জয় ও বিজয়ের তৃতীয় ও শেষ জন্ম। শিশুপাল চেদিরাজ দমঘোষের পুত্র। তাঁর মাতা শ্রুত-শ্রবা বসুদেবের ভগিনী। এই সম্বন্ধে তিনি কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই, কিন্তু আজন্ম শত্রু। জন্ম কালে তাঁর তিন চক্ষু ও চার হস্ত ছিল এবং জন্মেই গর্দভের মতো চীৎকার করেছিলেন। পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজন সভয়ে এঁকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দৈববাণী হয় যে এঁকে ত্যাগ না করে পালন করা হোক। যাঁর হস্তে ইনি নিহত হবেন, তিনি কোলে নিলেই এঁর অতিরিক্ত হাত খসে পড়বে ও তৃতীয় নয়নটিও মিলিয়ে যাবে। দমঘোষ সমস্ত রাজার কোলে পুত্রকে তুলে দিয়ে-ছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি। এক দিন কৃষ্ণ বেড়াতে এসে শিশুকে কোলে নিতেই তাঁর হাত খসে পড়ল, তৃতীয় নয়নটিও গেল মিলিয়ে। ভয় পেয়ে পিসি কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করতে। কৃষ্ণ তার এক শত অপরাধ ক্ষমা করতে রাজী হয়েছিলেন। এই কারণেই শিশুপাল কৃষ্ণ-বিদ্বেষী হয়েছিলেন।

গুরুজী বললেন : শিশুপালকে আমরা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভায় দেখি কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। পিতামহ ভীষ্মের আদেশে সহদেব উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। প্রতিবাদ করলেন শিশুপাল। কঠিন ভাষায় কৃষ্ণের নিন্দা করলেন। অনেক বাদানুবাদ হল। কৃষ্ণও সর্ব সমক্ষে শিশুপালের শত্রুতাচারণের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে, শিশুপাল তখন দ্বারকা দগ্ধ করে অপহরণ করে তাঁর পিতা বসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব। বভ্রুর স্ত্রী যখন দ্বারকা থেকে সৌভীর দেশে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে হরণ করেন। ছদ্মবেশে নিজের মাতুল কন্যা ভদ্রাকেও হরণ করেন বন্ধুর জন্য। শিশুপাল বিদর্ভ রাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ রুক্মিণীকে উদ্ধার করে নিজে বিবাহ করেন।

কৃষ্ণের কথা শুনে শিশুপাল সহাস্যে বিদ্রূপ করলেন, নিজের স্ত্রী অন্যপূর্বা ছিল, সভায় এ কথা প্রকাশ করতে তোমার লজ্জা হল না!

সভায় তখন প্রবল বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছে। কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানের অযোগ্য

বলে শিশুপালের সমর্থকেরা এক দিকে, অন্য দিকে পাণ্ডবের আত্মীয় বন্ধুরা। একটা প্রবল বিবাদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ সহসা চক্র দিয়ে শিশুপালের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতেই সভা শান্ত হয়ে গেল।

গুরুজী কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর বললেন: দন্তবক্রের সম্পর্কে আমরা সামান্যই জানি। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে যে দন্তবক্র ছিলেন করুষদেশীয় দুর্মদ মহাবলবান। শাম্বের সখা তিনি, আর কৃষ্ণ তাঁর মাতুলপুত্র। দ্বারকায় শাম্বের মৃত্যুর পরে তিনি কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিলেন।

শাম্ব ছিলেন শিশুপালের সখা। রুক্মিণী হরণ কালে যাদবদের হাতে পরাজিত হয়ে শাম্ব পৃথিবী যাদবশূন্য করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। শিবের তপস্যা করে মায়াময় বিমান লাভ করে দ্বারকা আক্রমণ করেন। কৃষ্ণ তাঁর সম্মুখীন হলে বললেন, তুমি আমার সখা শিশুপালের ভার্যাকে অপহরণ করেছ, তার পর অপ্রস্তুত অবস্থায় বধ করেছ শিশুপালকে। আমি এর প্রতিশোধ নিতে এসেছি।

কৃষ্ণ তাঁর চক্রে শাম্বের মাথাও কাটলেন।

এর পরেই গদা হাতে দন্তবক্র এলেন যুদ্ধ স্থলে। বললেন, তুমি আমার মাতুলপুত্র হতে পার, কিন্তু মিত্রদ্রোহী। তোমাকে বধ করে আমি আমার মিত্রের ঋণ শোধ করব।

দু'জনের গদাযুদ্ধ হল। এই যুদ্ধেই রক্ত বমন করে দন্তবক্রের মৃত্যু হল। শেষ হল জয় ও বিজয়ের কাহিনী।

শিশুপাল ও দন্তবক্রের কথা শুনে আমার একটি প্রশ্ন মনে এসেছিল। তাঁরা কি রাক্ষস ছিলেন, না সাধারণ মানুষ! এ প্রশ্ন করবার আগেই গুরুজী তাউজীকে বললেন: আর কোন অসুরের কথা বাকি আছে?

তাউজী একটু ভেবে বললেন: বাণাসুর ও উষাহরণের কথা বলেছেন, কিন্তু প্রদ্যুম্নের শম্বরাসুর বধের কথা বলেন নি।

গুরুজী বললেন: প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পুত্র। জন্মের ষষ্ঠ দিনে শম্বরাসুর তাকে অপহরণ করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। একটি মৎস্য শিশুকে গিলে ফেলে, কিন্তু ধীবরের জালে ধৃত হয়ে শম্বরাসুরের গৃহেই সে আনীত হয়। শম্বরাসুরের স্ত্রী মায়াবতী মাছের পেটে এই শিশুকে পেয়ে সযত্নে পালন করেন। কিন্তু দুজনের মধ্যে অনুরাগ ও আসক্তি দেখা দিলে প্রদ্যুম্ন মায়াবতীকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করেন এবং শম্বরাসুরকে বধ করে মায়াবতীকে দ্বারকায় আনেন।

আমার মন হল যে গুরুজী এই কাহিনীটিও বড় সংক্ষেপে বলিলেন। তাউজী বললেন: মায়াবতী কি অসুর কন্যা ছিলেন?

গুরুজী বললেন : না। অসুর কন্যাদের মধ্যে ব্যভিচারের কথা আমি শুনি নি। বিধবা রাক্ষসী শূর্পণখা রামকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, তাড়কা অত্যাচারী হয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে হারিয়ে, বাণাসুরের কন্যা উষা স্বপ্ন দেখে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে বরণ করেছিলেন। আমার মনে হয় যে মায়াবতী কোন অসুরের কন্যা হলে অনিরুদ্ধের পিতা প্রদ্যুম্নের সঙ্গে ব্যভিচার করতেন না।

একটু থেমে গুরুজী বললেন : বিষ্ণুপুরাণে একটু কৈফিয়ৎ আছে। মদনভস্মের পর তাঁর স্ত্রী রতি দৈববাণী শোনেন যে তাঁর স্বামী কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন নামে জন্মগ্রহণ করে শম্বরাসুরের গৃহে বাস করবেন। রতি মায়াবতী নাম গ্রহণ করে যেন শম্বরপুরে বাস করে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখি যে রতি শম্বরাসুরের পাচিকা ছিলেন। কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে দু জনেই তাঁদের পূর্বজন্মের সম্বন্ধের কথা জানতেন। প্রদ্যুম্ন বজ্রনাভ নামে এক অসুরের কন্যা প্রভাবতীকেও বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহ হয় গন্ধর্ব মতে। প্রভাবতী স্বেচ্ছায় প্রদ্যুম্নকে বিবাহ করেন।

গুরুজী বললেন : অসুরের কথা আমার শেষ হল। অসুর দৈত্য দানব ও রাক্ষসের কথা। কিন্তু এঁরা বেদ ও পুরাণের অসুর। এঁরা অনেক সময় ধর্মবিদ্বেষী ও অত্যাচারী বলে চিহ্নিত হয়েছেন, কিন্তু আমি এঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এঁরা বলবীর্যবান সচ্চরিত্র সরল বিশ্বাসী। ছলনা বঞ্চনা তাঁরা ঘৃণা করেছেন, বিপদ বরণ করেছেন দলবদ্ধ হয়ে। তারপর দেবতা ও মানুষের সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছেন। আজ শুধু তাঁদের নাম বেঁচে আছে, আর সেই নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা মিথ্যা নিন্দা। লোভী কাপুরুষ ইতরকে যখন আমরা রাক্ষস বলি, তখন আমরা নিতান্তই ভুল করি। শূর্পণখা ও তাড়কা রাক্ষসী নয়, রাক্ষসী—

বলে গুরুজী এক মুহূর্ত থামলেন, তারপর বললেন : রাক্ষসী এ যুগের সমাজ। সরল মানুষকে এই সমাজ পঙ্কিল করে তুলছে প্রতি দিন। বর্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধেও আমাদের প্রতিবাদ জানাবার সময় এসেছে।

বলে তিনি উঠে পড়লেন।



সকালে অনেক বেলায় আমার ঘুম ভাঙল। প্রভাতের প্রথম আলোয় পৃথিবী তখন ঝলমল করছে।

স্বস্তি এসে আমাকে মিসেস খুরানার খবর দিয়ে গেল। তিনি এই আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন। দণ্ডপাণি তাঁকে হরিদ্বার স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিতে গেছেন।

অপরিসীম বিস্ময়ে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম : কেন বলতো!

স্বস্তি সংক্ষেপে বলল : জানি নে।

মিসেস খুরানা কি স্বেচ্ছায় গেলেন, না তাঁকে যেতে হল! আমি জানি, এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে কেউ দেবেন না।

অসুরের কথা সমাপ্ত